দৃশ্য ও অন্তরাল

দৃশ্য ও অন্তরাল

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

ÕŽÂþÃ¶ßÂ±ô

DRISYO O ANTARAAL
A Bengali Novel by Dwijendra Bhowmik. Published by Akshar Prakashan
Kolkata - 9 West Bengal.
₹200.00

রচনা: ২০১৪-১৬

Âপ্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮
Ãপ্রচ্ছদ : দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

ISBN : 978-93-82599-38-8

অক্ষর প্রকাশন-এর পক্ষে ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলকাতা ৯ থেকে
ওয়াহিদা বেগম -কর্তৃক প্রকাশিত। বর্ণ সংস্থাপন : বাণী মৈত্র অ্যাপেক্স
সলিউশনস কলকাতা ১১২। মুদ্রক : এ পি প্রিন্টার্স ৮/১
গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন কলকাতা ৬৪।

মূল্য : ২০০ টাকা

বাবলি-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- সামন্যের নিবিড় সোপানে (নির্বাচিত কবিতা)
- রাতের পোশাক (নভেলা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

সারাদিন অস্থানে-কুস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে (পাড়ার কিছু লোক কথাটাকে এভাবেই চাউড় করে আনন্দ ও স্বস্তি দুই-ই পেয়ে থাকে।) কিংবা ঘরে শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে পতিতপাবন বেশ কিছুকাল ধরে অনেক কিছু দেখা বা শোনার অভ্যেস রপ্ত করে ফেলেছে। এই দেখা-শোনা ব্যাপারটা তার ভিতরে আপনাআপনিই ঘটে চলে। কোনো আয়োজন বা ব্যস্ততা, এমনকী কোনো উদ্যোগ-উপচারের দরকার হয় না। ফলে, ইদানীং একা থাকার মধ্যে সে তেমন কোনো হতাশা বা বিরক্তি টের পায় না। বরং সময়টা বেশ সহজে কেটে গিয়ে তাকে এক ধরনের বিশ্বাস দেয়। নির্ভরতাও। একটা সুখী সুখী আমেজ। কোনোকালেই সে-যে খুব কেজো লোক ছিল, তা নয়, আবার কুঁড়ে বলতে সচরাচর যা বোঝায় তেমন কামচোরও না। বিড়ি কিনবে বলে হয়তো পাড়ার নিতাইদার দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছে; নিতাইদা তখন গুটিকয় খদ্দের সামলাতে সামলাতে আপনমনে গাল পাড়ছে, "সব শালা নবাবপুত্তুর! এট্টু আইস্যা যে চা-টা লইয়া যাবি, তা না, অডার দিয়াই খালাস।"

"কাদের কথা বলছেন নিতাইদা?" পতিত জিজ্ঞাসা করে।

"কাদের আবার? কেলাবের ছেলেগুলান। চায়ের অডার দিয়া সেই যে বাবুরা ঢোকছেন ভেত্‌রে, আর হুশ নাই তেনাদের— হুশ য্যাখন আইব আমার গুষ্টির তুষ্টি কইরতে কি বাকি রাখবো কিছু? কিন্তু তুমিই কও পতিত, দোকান-খদ্দের ফ্যালাইয়া আমার কি ফুরসত হয় যে, ওগোরে দিয়া আসি?"

"তা দিন না, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।" যথার্থ অলস হলে কি পতিত নিজে থেকেই এমন রাজি হয়ে যেত? আর-পাঁচটা মানুষ নির্ঘাত প্যাঁচাল পারত। নানান কাজের অছিলায় সটকে পড়ত, নয়তো একটা ফাউ চা খাওয়ানোর ডিমান্ড করে বসত।

"সব শালা চুতিয়ার মাগনা পাবার শখ। সকাল থিক্কা মাত্তর একখান চায়ের বদলে ব্যাঞ্চের উপর পাছাটারে সেই যে থেবড়েথুবড়ে ঘণ্টার পর

ঘণ্টা ফ্যানের তলায় বইস্যা বইস্যা ফকটাই খবরের কাগজখান পড়োস আর আমার ইলেকটিরি বিলের পুটকি মারাস তখন খেয়াল থাকে না? আরে বাবা, বিয়া-শাদি করা বউটারেও কি মাঝেসাঝে এগরোল, ফুচকা এসব না খাওয়াইলে, ভিডিও বা সিনেমা না দেখাইলে চলে? বিনা সোনো-পাউডারে সে তোগোরে এম্‌নি এম্‌নি রান্নাবান্না কইরা খাওয়ায়, না দিনের পর দিন শরীলটার উপর তোগোর হাপুসহুপুস মাখামাখি আর জোরাজুরি মুখ বুইজা সহ্য করে? বউরে যে কত ভালোবাসস হেইডা কি জানতে বাকি আছে? অইন্য মাইয়ামানুষ দেইখলে তো শরীলটা তোগোর ডাঙায় উঠন কাতোল মাছের মতো খাবি খায়। য্যান অ্যাখুনি দম বাহির হইয়া যাইব। ভাবস কখন মাইয়াটারে পাঁকাল জলের ভেতর টাইন্যা নামাবি আর, তার নরম মোলায়েম দেহটারে জাপটে-পিস্টে চেটেপুটে খাবলে খাবলে একখান নিস্পন্দ নিথর মাংসের পিণ্ড বানায়া তুলবি। তোগোর মতো হাভাইত্যা খানকিগুলানরে চিনতে আমার বাকি আছে না কি?"

চায়ের ক্রেটটা নিতে নিতে পতিতের মনে হলো নিতাইদা এতসব গালমন্দ করল অথচ খরিদ্দারদের কেউ কোনো সাড়া দিল না? বেমালুম হজম করে গেল? এসময়, মানে প্রায় মধ্যাহ্নবেলায়, সূর্য যখন মাথার উপরে যাব যাব করে সামান্য পুবে হেলে চারপাশকে গনগনে আলোর তাপে ঝলসে দিচ্ছে, তখন খদ্দের বলতে অবশ্য গুটিকয় পথচলতি মানুষ। তাদের একজন বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বচ্ছরের পুরোনো কাশিকে সারা শরীর দিয়ে ঠেকিয়েঠুকিয়ে দেয়ালের গায়ে পিঠ হেলিয়ে আলসেমিকে একটু জিরিয়ে নেবার সুযোগ করে দিতে দিতে পিটপিট করে পতিতকে দেখেও না-দেখার ভান করে বসে আছে। আর-একজন, মাঝেমধ্যে যাকে এ-তল্লাটে দেখা যায় সাইকেলে সওয়ার হয়ে কোথায় ব্যস্তসমস্ত চলেছে, খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে পা দুটোকে অনবরত নাচিয়েই চলেছে— অনেকটা প্যাডেলের ঢঙে, যেন বাইসাইকেল চালানোর কৃৎকৌশল ওর শরীরের সঙ্গে মিশে ওকে আর ওর সাইকেলকে সাইকেল-আরোহী সত্তায় সমাপতিত করে রেখেছে। মানুষটার তোবড়ানো গাল, ভুরুর উপরের কাটা দাগ আর জামার ছেঁড়া পকেট থেকে উঁকি-মারা ভাঁজসহ কাগজের টুকরো নতুন কোনো পরিচয়ের আভাস না দিলেও এ-কথা আন্দাজ করা খুব-একটা কাকতালীয় হবে না যে, লোকটা সারাদিনই অর্থোপার্জনের ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়: ইহাঁ কা

মাল উহাঁ, আর, উহাঁ কা মাল ইহাঁ। পতিত এসব লক্ষ করতে করতেই একটা বিড়ি ধরায় এবং বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে কখন নিতাইদা লোহার তৈরি চায়ের ক্রেটে একটা একটা করে চা-ভরতি কাচের গেলাস সাজিয়ে তার হাতে তুলে দেবে ক্লাবে পৌঁছে দেবার জন্য।

ক্লাবের ছেলেগুলো পতিতকে ভাগ দেয় চায়ের। বিড়ি খাওয়ায়। কেস্টা একসময় ক্যারমের স্ট্রাইকার প্যান্টের কাপড়ে ঘষতে ঘষতে বলে, "পতিতদা, খবরটা শুনেছ?"

"কী খবর?"

"বিপিনদার বউটা কাল থেকে নিপাত্তা।"

"কোন্ বিপিন?"

"আরে বাজারে মাছ বেচে যে বিপিন। ডোবার ধারে বাড়ি।" পল্টন ধরিয়ে দেয়।

"ও তাই বল, মাছ-বিপিন। তা, বউ পালাল কেন?" পতিত অবাক হয়ে কেস্টার দিকে তাকিয়ে জানতে চায়।

"আমি জানব কেমন করে? তোমাদের পাশের বাড়ির হরনাথ পোদ্দারের ছোটো ছেলে কিশোরকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। লোকে বলাবলি করছিল, ছেলেটার সঙ্গে বিপিনের বউ ইদানীং একটু মাখামাখি ঢলাঢলি করত। হয়তো সেই ছেলের সঙ্গেই ভেগেছে।"

অনেকক্ষণ ধরে এইম করেও কেস্টা ক্যারমের একটা সহজ ইঞ্চি ঘুঁটি পকেটে ফেলতে ব্যর্থ হলো, উলটে অপোনেন্ট-এর বেস-এ দুটো ঘুঁটি সাজিয়ে দিল। ওর পার্টনার, পাড়ার অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার রঞ্জন চৌধুরির পার্টটাইম ড্রাইভার ভোলা, জামার কলার থেকে গোঁজা রুমালটাকে টেনে নিয়ে নেহাতই মুদ্রাদোষে হাতে করে শূন্যে একপাক ঘুরিয়ে কপালের ঘাম মুছে ওটা যথাস্থানে চালান দিতে দিতে বলল, "যা রে শালা, গিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে আয়। এক মেয়েছেলের কথায় যদি হাত কাঁপে, তো খাবি কী, ঝাঁঝেই মরে যাবি যে রে!"

সকলে এক চোট হেসে নিল।

পল্টন বেস-এর ঘুঁটি দুটো টপাটপ ফেলে রেড-টাকেও ভোলার ডান পকেটে চালান করে দিল। ওর পার্টনার জিবে, মানে, স্বর্ণকার ফণি হালদারের

মেজো ছেলে, হালদার পরিবারের একমাত্র মাধ্যমিক-পাশ জীবন হালদার হাতে তালি দিয়ে বলল, "দেখেছিস ভোলা, পল্টনের এম্‌নিতে কোনো এইম নেই ঠিকই, কিন্তু গর্তের এইম-টা বেশ খাসা! পার্টনার হো তো অ্যায়সা।"

"হরনাথের তো মেলা টাকা। পাওয়ারফুল লোক। কীসব কারবার-টারবার চালায়। সে কী বলছে? থানা-পুলিশ করেনি?" পতিত কথাটা সবে শেষ করেছে, দেখল কিংসাইজ সিগারেট টানতে টানতে খোদ হরনাথ পোদ্দার দামি একটা মোবাইল বাঁ-হাতের মুঠোয় নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সোজা ক্লাবের ভিতরে প্রবেশ করল।

"অ্যাঃ, ছ্যা ছ্যা ছ্যা... কী হতশ্রী চেহারা হে তোমাদের ক্লাবঘরের! ভেঙেচুরে যে একশা! ক্যারামবোর্ড-এর দশাও তো দেখছি তথৈবচ। আজকাল সরকার থেকে ক্লাবগুলোকে তো মেলা টাকাকড়ি দিচ্ছে। পাওনি তোমরা? না কি সব গোল মেরে দিয়েছ হে?" সকলকে চুপ থাকতে দেখে একটু থেমে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ফের বলে চলল হরনাথ, "আচ্ছা আচ্ছা, বাদ দাও ওসব। আমিই বরং টাকার বন্দোবস্ত করে ঘরটাকে পাকা করে দেব। একটা ক্যারামবোর্ড, কয়েক সেট তাসও কিনে দেব। চাইলে মাল্টিজিমও বানিয়ে দিতে পারি। একটু শরীরচর্চা-টর্চাও হবে। তোমরা হলে গিয়ে সব আমার ছেলের বয়সি। ইয়াং ব্লাড। দেশের ভবিষ্যৎ। সারাদিন বিড়ি ফুঁকে আর পরনিন্দা পরচর্চা করে সময় কাটাও, সেটা কি ভালো? কিশোরকে তো পইপই করে কত বলি, যা বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেলাধুলা কর, মাঝেমধ্যে পিকনিক-টিকনিক কর। আমরা ছোটোবেলায়, বুঝলে বাবা, কত কী করেছি। দুষ্টুমিও করেছি। কিন্তু কখনো পাঁচকথা পাঁচকান করে সময় কাটাইনি।"

একটানা বেশ নাটকীয় বোলচালে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল যখন হরনাথ, তখন পতিতের মনে পড়ে গিয়েছিল ছোটোবেলায় টানা তিন-চার বছর গরমের ছুটিতে ওদের একসঙ্গে নাটকে অভিনয়ের কথা। ডাকাবুকো কাঞ্চনদা ছিলেন পরিচালক। বছর দুয়েক আগে এক বর্ষাদিনের ভোরবেলায় বড়োপুকুরে তার লাশ ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কেউ কেউ কানাঘুসো ঘটনাটাকে হত্যা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলে এই হরনাথ যখন তাকে আত্মহত্যা বলে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিল, পতিত-মৃণালের মতো হাতে-গোনা দু-একজন ছাড়া পুলিশসুদ্ধ সকলেই মেনে নিয়েছিল তা। কাঞ্চনদার প্রায় সব নাটকে হোমরাচোমরা ভিলেন ভিলেন গোছের রোলে অভিনয় করার

সুবাদে হরনাথের ওই বয়েসেই গলার টোন সেই যে বদলে গিয়েছিল, আজও কথাবলায় সেই ধরতাই চাল অটুট রয়ে গেছে। হরনাথকে কিছু বলতে শুনলে পতিত তাই ঠোঁটের কোণে সামান্য না হেসে পারে না। সম্ভবত সেই হাসির কারণেই, কিংবা হতেও পারে পতিতকে কোণঠাসা করার দীর্ঘদিনের মনোবাসনার কারণে হরনাথ বাচনভঙ্গির নাটকীয়তায় আরও বেশি করে অবিচল থেকে সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তোমাকেও বলি বাপু পতিত, নিজে তো কোনো কামকাজ করো না। বাপের সম্পত্তি ছিল, তাই খেয়ে-পরে দিব্যি চেকনাই মেরে আছ। এই বয়েসে কোথায় ছেলেপুলেগুলোকে নানা কাজে উৎসাহ দেবে; তা না, বসে বসে ওদের ঘাড় মটকে বহাল তবিয়তে চা-বিড়ি প্যাঁদাচ্ছ আর, যত আকথা-কুকথা নিয়ে খোশগল্প মারাচ্ছ। হরনাথ পোদ্দার, কিংবা তার চোদ্দো গুষ্টির কেউ তোমার খায় না পরে যে, তাদের ব্যাপারে কাঠি করতে লেগে আছ? পারবে, এই হরনাথ যদি একখান আছোলা তোমার গুয়ায় ঢোকায়, সেখানা সারা জীবনে বের করতে?"

পতিত দেখল কথাগুলো বলে হরনাথ পোদ্দার ওরফে পোদুবাবু (পিছনে ওকে পাড়ার বয়স্ক থেকে ছেলে-ছোকরার দল সকলে এই নামেই সম্বোধন করে থাকে; কারণ ওর পদবি যেমন পোদ্দার তেমনই শরীরের তুলনায় পাছাটা বেঢপমার্কা বড়ো।) ক্লাবঘর থেকে গটমট করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "কিন্তু পোদু, কিশোর যদি সত্যি সত্যিই বিপিনের বউকে নিয়ে ভেগে থাকে, কিংবা ধরো মন্দির-টন্দিরে গিয়ে বিয়েই করে ফেলে, তুমি কি মেয়েটাকে নিজের বউমা মেনে বাড়িতে জায়গা দেবে?"

"ও পতিতদা, কী তখন থেকে একা একাই বিড়বিড় করো? যা বলবার তা জোরে জোরেই বলে ফেলো না। আমরাও শুনি।" পল্টনের কথায় পতিতপাবন থতমত খেয়ে বলল, "নাঃ যাই, কিশোরের খোঁজটা একবার হরনাথের কাছ থেকেই বরং জেনে আসি। যতই হোক, পাশের বাড়ি বলে কথা। সামান্য বড়ো হলেও ন্যাংটো বয়েসের একরকম বন্ধুও বলা চলে। লোকে যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে হয়তো খুব ভেঙে পড়েছে বেচারা।"

"ভেঙে পড়েছে না ছাই। আজ সকালেই তো দেখলাম বাজার থেকে ইয়া বড়ো বড়ো গলদা চিংড়ি কিনছে।" কেষ্টা বলল।

কেষ্টার কথার রেশ সঙ্গে নিয়ে হরনাথের বাড়ির সামনে পৌঁছে সত্যি

সত্যিই চিংড়ি মাছের স্বাদু আঘ্রাণ পেল পতিত।

গলদা চিংড়ি রাঁধত বটে মা। দুধের মতো নারকোল-বাটা রসে মজিয়ে সে এক অসাধারণ সোয়াদ। অত যে হাঁকডাক ঠাকুমার রান্নার, তিনি পর্যন্ত পতিতকে বলতেন, "তোর মার চিংড়িপাকের গন্ধে আমার মতো বিধবারও জিভে জল গড়িয়ে আসে।" বলে অবশ্য জিভ কেটে নিতেন দাঁতে। লজ্জায় না লোভে আজও বুঝে উঠতে পারে না পতিত।

হরনাথের বাড়ি থেকে আসা চিংড়ি-রান্নার গন্ধের কারণেই সম্ভবত ঢুকি ঢুকি করেও পতিতের কেমন ইতস্তত ঠেকছিল। একজন পথচারী ঠিক সেইসময় চলতে চলতে তার কাছাকাছি এসে সামান্য থমকে দাঁড়াল। লোকটার হাবেভাবে চালচলনে একটু কি শুঁড়-ছাড়ানো গুটিয়ে-থাকা গলদা চিংড়ির ভঙ্গি? লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফের চলতে শুরু করলে পতিত ঠাহর পেল, ওর দু-পায়ে দুই সাইজের জুতো। হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড।

"ঠিকই ধরেছেন। হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড। তবে জন্মগত না, একটা অ্যাকসিডেন্টে। আজও কোনো নেতাকে ধরে সার্টিফিকেট জোগাড় করে উঠতে পারিনি দাদা। জান-পহেচান আছে নাকি কেউ?" পতিত কী বলবে বুঝতে-না-বুঝতেই লোকটা এবার কাঁকড়ার মতো ল্যাগব্যাগে ঢঙে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে যা বলে গেল তাতে এতক্ষণের ইতস্তত ভাবের সঙ্গে মনে মনে ভ্যাবাচ্যাকা একটা ভাবও জুড়ে বসল। "চিংড়ির গন্ধটা কিন্তু মশাই জব্বর খেলে বেড়াচ্ছে বাতাসে।" বলে, গন্ধের পুরোটা যেন সালটে নিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষটি পাক্কা খেলুড়ের মতো সামনের গলির মুখে গোঁত্তা খেয়ে নিমেষে কর্পূরের মতো উবে গেল।

খেলাই বটে, কিন্তু কী খেলায় যে এমন গন্ধের মতো জলজ্যান্ত অনুভূতিকেও গায়েব করে ফেলা সম্ভব, সেইটে অবাক হয়ে বুঝতে চাইছিল পতিত। উদাসভরে সে তাকাল হরনাথের বাড়ির নতুন অংশটার দিকে। এখনও কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। একটা কাক কিছু-একটা ঠোঁটে করে সেই নবীন অংশের সদ্য গাঁথনির খোদলে ঢুকিয়ে রাখছিল। ঠিক তক্ষুনি মনে পড়ে গেল।

ইয়েস, পিট্টু খেলা। ছেলেবেলায় ফুটবলের ব্লাডার ফেটে গেলে নতুন ব্লাডার কেনার চাঁদা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সবাই মিলে অগত্যা ছোটো থেকে বড়ো গুটি সাতেক টালির ভাঙা টুকরো আর ক্রিকেটের বল জোগাড়

করে শুরু হতো সেই খেলা। দুষ্টুমি করে টালির ভাঙা টুকরো বা পিট্টু গায়েব করে খেলা ভণ্ডুলে মেতে উঠত কেউ কেউ। চা-দোকানের নিতাইদা বল মেরে পিট্টুর থাম ভেঙে দিতে ছিল সিদ্ধহস্ত, আর ল্যাংড়া ফণি ও হরনাথ মিলে পিট্টুর গুটি গায়েব করায়।

পাশের বাড়ি হলেও প্রায় বছর দুয়েক আগে শেষ এ-বাড়িতে এসেছিল পতিত। হরনাথের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচুর খাইয়েছিল পোদু। ফিশ কবিরাজি, চিকেন টিক্কা, গলদা চিংড়ির মালাইকারি সহ তিন রকমের মাছ, কচি পাঁঠার ঝোল, চার রকমের মিষ্টি, আইসক্রিম আর বাহারি পান। আহাহাহা, সে-পানের স্বাদ ভুলবার নয়। পোদু জনে জনে ডেকে বলেছিল, "মা আমার পান খেতে বড়ো ভালোবাসত কিনা! তাই কলেজস্ট্রিটের খোদ 'কল্পতরু'-তে অর্ডার দিয়ে আমি নিজে এই পান নিয়ে এসেছি। এক-একখানার দামই পড়েছে একুশ টাকা। ওটা কিন্তু আপনাদের সকলকেই চেখে দেখতে হবে। নাহলে আমার মা-র আত্মা শান্তি পাবে না।"

পানটা মুখে পুরতেই পতিত স্পষ্ট দেখেছিল মাসিমা, অর্থাৎ কিনা হরনাথের মা, মুচকি হেসে দোতালার ঝুলবারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। অনুসরণ করে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট শুনেছিল জাঁতিতে সুপাড়ি কাটার শব্দ। ততক্ষণে অবশ্য তার মুখের থেকে পান পাকস্থলীর ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে মাছ-মাংস-মিষ্টির সঙ্গে মিশে পেটে বুরবুরি কাটছিল আর, থেকে থেকে ঢেকুর হয়ে ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে বাইরের বাতাসে গোত্তা খেয়ে ফের নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ছিল যুগপৎ খাদ্য ও শ্বাসনালী বেয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে, ফুসফুসে। পতিতের মনে হয়েছিল, হরনাথ বেচারা এত খরচাপাতি করেও মায়ের আত্মাকে বোধ করি শান্তি দিতে পারেনি। মাসিমা কি বেঁচে থাকতে 'কল্পতরু'-র পান খেতে চেয়েও পাননি? হরনাথকে ডেকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে পতিতকে সেদিন খুব অপমানিত হতে হয়েছিল।

"এইজন্যই বলে শালা কুত্তার পেটে ঘি সহ্য হয় না। গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে গাড্ডু এখন মা-র আত্মা দেখতে পাচ্ছে। কেন? মা কি আমার শালা তোমার মতো নেমকহারামের হাতবাক্স যে, এত কিছু করার পরও আমার ঘাড়ের উপর এসে চাপবে?"

একঘর লোকের সামনে পোদুর সেই হুহুকাংরেই ব্যাপারটা থেমে থাকেনি, ওর বড়ো ছেলে অমর গুটিকয় বন্ধু জুটিয়ে রীতিমতো শাঁসিয়েছিল, "বলিহারি পতিতকা, ঠাকমার শ্রাদ্ধে এসে ঠাকমাকে নিয়েই কেচ্ছা করতে তোমার লজ্জা করে না? সারাদিন ধর্মের ষাঁড় হয়ে এইখানে সেইখানে তো ঘুরে বেড়াও; পাঁচটা লোক যদি ধরে-বেঁধে দু-চার ঘা দেয় নিজেকে বাঁচাতে পারবে তখন? বয়েস হচ্ছে, চুপচাপ থাকতে পার না?"

চুপ হয়েই দাঁড়িয়েছিল সে। সেইসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়াতে অবশ্য পতিতের বিশেষ কোনো দুঃখ বা অভিমান হচ্ছিল না। বরং সত্যি সত্যিই বিপিনের বউকে নিয়ে কিশোর পিঠটান দিয়েছে কি না, দিলেও তার কোনো খবরাখবর আছে কি না, সেই বৃত্তান্তের বিশদ জানতে তার মনটা কেমন যেন বেমক্কা কুতূহলী হয়ে পড়েছিল। এমন সময় দেখল সামনের রাস্তা দিয়ে অমর তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

"কী গো পতিতকা, তখন থেকে বাড়ির সামনে ঘুরঘুর কর যে বড়ো? খবরটা তাহলে তোমার কানেও পৌঁছেছে। নতুন কী জানতে চাও শুনি? যদি পালিয়েই থাকে, তবে ঠিকই তো করেছে কিশোর। বিপিন শালা কি ধ্বজ যে নিজের বউকে সামলে রাখতে পারে না? মাছ ধরা-বেচা করতে করতে কখন-যে জাল ছিঁড়ে শালার অত সোহাগের কাতলাটাই পালিয়ে যায়, টেরও পায় না সে? ও-মদনার কি কোনোদিন কিছু হবে? সক্কাল থেকে বাবার কাছে এসে কান্না জুড়েছে! বলে, 'কিশোরের কাছ থিক্কা আমার বউডারে ফিরায়ে দ্যান। বউডার কুনো দোষ নাই, আমারই সব দোষ। তারে আমি ক্ষমা কইরা দিছি।' আরে গাড্ডু! ক্ষমা করে হবেটা কী? কিশোর যদি তোর বউকে ফুঁসলে পালিয়েই থাকে সেটা কি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে করেছে? বলে কিনা, 'বাবু আপনের তো দারোগাবাবুর সঙ্গে খুব যোগাযোগ, তেনারে ধইরা-কইরা যদি কুনোমতে ফিরায় আনা যায় তাগোরে।' শালা! তোমার বউ স্বেচ্ছায় অন্যের সঙ্গে পালাবে, তাতে থানা-পুলিশ করে কোন্ সুরাহাটা হবে শুনি? তাছাড়া প্রমাণই-বা কী যে, কিশোরের সঙ্গে সে-মাগিটা ভেগেছে। তোমাদেরও বলি কাকা, বিপিনকে তো গিয়ে একটু বোঝাতে পারো। কান্নাকাটি বা হই-হট্টগোল করে এখন কিচ্ছুটি হবে না। থানা-পুলিশ বা বাড়াবাড়ি কেউ কিছু করলে শেষমেশ ওকেই-না ধরে জেলে পুরে দেয়।" বলে, অমর সটান বাইক নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে।

শেষের কথাগুলোতে পতিতের মনে হলো অমর কি তবে তাকেই শাঁসিয়ে গেল উলটে? "কেন রে হারামি, আমি কি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছি, না এ-বিষয়ে কাউকে কিছু বলেছি যে, আমাকে টার্গেট করিস? কথায় কথায় খ্যাম্তা দেখাস? আমি কি উদ্‌গান্ডু না তিনকুলে কেউ আছে আমার যে ভয় দেখাতে চাস? একদিন তোর পোঙায় আমি দেব এমন একখান গরম লোহা, দৌড়ে কূল পর্যন্ত পাবি না। তোর বাপ পোদুও সে-ভিডিও সোফায় বসে বসে দেখবে আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে।"

কথাগুলো পতিতই বলছিল না অন্য কেউ, এবং কার উদ্দেশে তা ঠিক বোঝা গেল না, কারণ ত্রিসীমানায় তখন অমর বা হরনাথ বা অন্য মানুষজনের কেউ উপস্থিত ছিল না। ছিল শুধু ভোলা। পাড়ার নাদুশনুদুশ হলদে কুকুরটা। ঘেউ ঘেউ ডাক ছেড়ে সে-ব্যাটা কোন্ শত্রুর উদ্দেশে দৌড় লাগাল, কে জানে! কিছু পরে পতিত যখন বাড়ির দিকে পা বাড়াল, দেখল অমর মোটরবাইকে চেপে তাকে পেরিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল।

"পতিত, ও পতিত, বাড়ি আছ না কি?" সবে বাড়ি ফিরে আরাম চেয়ারে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, ঠিক তখুনি কে নাম ধরে ডাকে?

"কে?" সাড়া দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে পতিত।

"আমি... হরেনদা।"

"ও... আপনি... আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।" পতিতপাবন হরেনদাকে সামনের বারান্দাঘরে এনে বসায়। "হঠাৎ কী মনে করে দাদা? কোনো অঘটন-টঘটন নয় তো?"

"না না। একটা বিশেষ কাজে মনোতোষের বাড়ি এসেছিলাম। শুনলাম মায়ের মৃত্যুর পর তোমার নাকি একদিনও আর এখানে থাকায় মন নেই, কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছ? এমনকী, বাড়িখানা পর্যন্ত বিক্রি করে দেবে ঠিক করেছ? জানোই তো, আমার এক ছেলে এক মেয়ে। জামাই বলছিল, 'বাবা, আপনাদের পাড়াটা খুব ভালো। জমি, বাড়ি কিছু বিক্রি থাকলে খবর দেবেন।' তাই ভাবলাম, যাই, একবার নাহয় তোমার মুখেই শুনে আসি বৃত্তান্ত।"

পতিতের মনে পড়ে গেল, সেদিন কথায় কথায় মনোতোষদাকে সে তার এই একা একা থাকা নিয়ে দু-চার কথা হালকা চালে বলেছিল। বলেছিল, এই বাড়ি এই পাড়া বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। খুব ইচ্ছে করে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। নানান সব লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলে। কিন্তু মনোতোষ মিত্র যে সে-কথার এই মানে করে বসবে এবং হরেনদাকে ফলাও করে বলবেও সেসব, তা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি তখন। কিছুক্ষণ তাই চুপ করে থেকে সে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "বিক্রি! আরে দাদা, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে থাকব কোথায়? বাবা-মায়ের এই শেষ স্মৃতিটুকু সম্বল করেই তো ভরসা পাই মনে। যখন শরীর আর সঙ্গ দেবে না তখন নাহয়—"

"সকলে এরকমই ভাবে বটে। শুনেছি তিনকুলে কেউ নেই তোমার। সময়মতো সব বন্দোবস্ত করে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। না কী বল?" মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন হরেনদা।

মানুষটা একটু সোজাসাপটা গোছের। কথা বানিয়ে বলার অভ্যেস নেই

যেমন, কথাকে লাগাম পরিয়ে একটু সহিষ্ণুতা দিয়ে বলার সহবতও নেই। পতিতরা এ-পাড়ায় আসার দু-এক বছর আগে বি.এন.রেলওয়ে-র কর্মচারী হরেনদার বাবা নৃপতি চৌধুরি 'চৌধুরী ভিলা' বানান। বিপত্নিক হরেনদা কয়েক বছর হলো সরকারি চাকরির থেকে রিটায়ার করে ছেলে-বউমা-নাতিকে নিয়ে দিব্যি আছেন। দীর্ঘদিন ধরে নেশা বলতে হরেনদার দুটো—নস্যি আর রেডিয়োয় খবর শোনা। আরও একটা ব্যাপার আছে, তবে তাকে নেশা বলা যাবে কি না তা তর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু সেই বিতর্কিত ব্যাপারটা হলো: এ-তল্লাটে কোনো জমি-বাড়ির সন্ধান পেলে বিনা দালালিতে আত্মীয়স্বজনকে সে-সন্ধান দিয়ে কেনাবেচায় মধ্যস্থতা করা। লোকে রসিকতা করে বলে, হরেনদা পুরো তল্লাটকে চৌধুরি অ্যান্ড কোং-এর খাসতালুক বানিয়ে-তোলার ঠিকেদারি নিয়েছে।

পতিত বলল, "সে ভাববেন না হরেনদা। শিগগিরই বন্দোবস্ত করে ফেলব সব।"

"আমার জামাইয়ের প্রস্তাবটাও তখন একবার ভেবে দেখো কিন্তু ভাই। কেমন? আজ উঠি। নাতিটাকে আবার স্কুলের থেকে নিয়ে আসতে হবে।"

"কেন? স্কুলবাস আছে তো। সেদিন দেখলাম আপনার বউমা পাড়ার মোড়ে আরও সব মেয়ে-বউদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। চোখাচোখি হতে একটু হাসলও।"

"স্কুলবাস মালিকদের কী এক স্ট্রাইক আজ—" একটু থেমে, যেন নিজের ভিতর গুমরে-থাকা উষ্মাকে জারিয়ে তুলে ফের শুরু করলেন হরেনদা, "কথায় কথায় তোমাদের এই বন্‌ধ্‌-হরতালে উচ্ছন্নে যাচ্ছে সব কিছু। এসব করে লাভের লাভ কিছু হয়? না ঘেঁচু! গুচ্ছের হয়রানি শুধু।"

হরেনদার এতক্ষণের কথাবলার বিনীতভাব হঠাৎই কেমন মিলিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ রীতিমতো কর্কশ আর অসহিষ্ণু শোনাল। যেন পতিতকেই যত বন্‌ধ্‌-হরতালের হোতা ঠাউরে নিলেন। হরেনদার এই হঠাৎ উত্তেজনার কারণ, পতিতের মনে হলো, বন্‌ধ্‌-হরতাল নয়, সম্ভবত অন্য কিছু। সেটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও মন থেকে মেনে নিতে চাইছিল না সে। তাই কোনো বাদানুবাদে না গিয়ে কথাগুলোকে মুচকি হাসির প্রত্যুত্তরে হজমই করে নিচ্ছিল।

কিন্তু হরেনদার বোধহয় তার হাসিমুখ হজম হলো না: "তোমার আর

কী! না চাকরি-বাকরি, না করলে বিয়ে-শাদি। সময় নেই অসময় নেই পথেঘাটে কোন্ উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াও, কে জানে। লোকেরা নানান সব গল্পগাছা করে। আমি অবশ্য কান দিইনে তাতে। কিন্তু বলিহারি বউমাকে। কথায় কথায় যে কী অত হাসির দেমাক, বুঝি না বাপু।" হরেনদার ঝুলি থেকে বেড়ালটা বেরিয়েই পড়ল। মনের মধ্যে যে-আন্দাজটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল সেটা এমন মিলে যেতে হরেনদার বেমক্কা আক্রমণের পরেও তাই পতিতের হাসিই পেল খুব।

হাসতে হাসতেই হরেনদার বউমার কথা ভেবে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল পতিতের। বড়ো সাদাসিধে মেয়েটা। দেখা হলেই খোঁজখবর নেয়। চোখ দুটিতে যেন কোন্ রূপকথার মায়া জড়ানো। মায়ের কথা মনে পড়ে যায় পতিতের। মা-র চোখেও কী এক জাদু ছিল। সে-চোখের দিকে একবার দৃষ্টি গেলে মন ভালো হয়ে যেত তার। ওই চোখ দুটোর হদিশ নিতেই কি তবে সময়-অসময় নেই প্রায়শ হরেনদার বাড়ির চারপাশে হেঁটে আসে সে? বউমার সঙ্গে দেখা করার সাধ হয়?

"এই যে কাকু, এমন অবেলায় দুপুর-রোদ মাথায় করে চললেন কোথায়?" হরেনদার ছেলে-বউ, সঞ্চিতা, কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে।

"আর বলো কেন, রান্নার দিদি কামাই দিয়েছেন আজ, তাই দু-মুঠো গিলতে বড়ো রাস্তার দিকে যে-খাবার-হোটেলটা আছে, সেইখানে যাচ্ছি।"

"কিন্তু এটা তো ঘুরপথ। অনেক বেশি হাঁটতে হবে আপনাকে। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে..."

এটুকু বলে থেমে যায় ও। কিংবা আরও কিছু বলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেসব পতিতের কানে পৌঁছায় না। সঞ্চিতার দিকে চেয়ে নিজের অস্তিত্বই যেন লোপ পেয়ে গেছে তার। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের তীব্র তাপ মেয়েটির অসংখ্য রোমকূপে জমে-থাকা স্বেদবিন্দুগুলির সঙ্গে মিশে চোখে-মুখে, কাঁধ ভেঙে পিঠে, গলদেশ চুঁয়ে চুঁয়ে বুকে-পেটে, এবং তারও পরে নাভিকুণ্ডল ছাড়িয়ে উরুর সীমানা পার করে পায়ের পাতা অবধি বেমক্কা বেচাল ঢুকে পড়তে পড়তে ক্রমশই পেলব, ক্রমে আরোই মরমি করে তুলেছে ওকে। পতিতের মনে হলো, শাড়ির আঁচলে সেই রৌদ্রভেজা ঘাম মুছতে মুছতে মেয়েলি আড়ালটুকুর সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিতে নিতে অথবা কিছু কথা মনের ভিতরে বয়ে এনে, এবং কিছু কিছু কথা দূরে ঠেলে সঞ্চিতা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে অসমাপ্ত বাক্যদের পূর্ণ করে তুলতে। পতিতের নিজেকে স্খলিত বা ভূতগ্রস্ত বোধ হল; কথা দিয়ে সেই ভাব চাপা দিতে চাইল সে: "হোক-না বেশি দূর, এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেই ভালো লাগে আমার। ওদিকের পথে পুরোনো বসতবাড়িগুলো ভেঙে ইদানীং এত ফ্ল্যাট উঠছে যে, ধুলো-কাঁকর আর পথের মধ্যে যথেচ্ছ ফেলে-রাখা ইটবালিতে হাঁটাই দায়।"

"একটু জল খাবেন? যে গরম পড়েছে আজ! সঙ্গে ছাতাও তো নেই দেখছি আপনার।"

সঞ্চিতাকে পতিতের তখন আর হরেনদার বউমা কিংবা ওর ছেলে মৃণালের স্ত্রী অথবা ওদের একমাত্র সন্তানের মা বলে মনে হয় না। মনে হয় এমন এক আপনজন, যাকে হয়তো সে কত কত দিন কোলে-কাঁখে করেছে, আবার কখনো-বা ওরই কোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে পেয়ে এসেছে নির্মল

স্বস্তির মতো এক বাধহীন স্বাচ্ছন্দ্য, কখনো ঘামে-ভেজা ওর আঁচলের স্পর্শে শরীরের পুরোনো ক্ষতে নেমে এসেছে শম-শীতলতা-শান্তি, আবার কখনো ও অনেক অনেক মানুষের ভিড়ের ভিতরে থেকেও হয়ে উঠেছে এমনই বিশেষ-একজন, যাকে সে দূর থেকে জানিয়েছে অভিমান; আর তারপর, সেই অভিমানটুকু বুকে চেপে পতিতের হৃদয় উদ্‌বেল হয়ে ছুটে যেতে চেয়েছে আলভাঙা বিস্তীর্ণ খেতের ওপারে কুয়াশার ধূসরতা মেখে দাঁড়িয়ে-থাকা মাটির ছোট্ট এককোঠা বাড়িটির উদ্দেশে: তার দাওয়ায় চুপটি নিবিড় বসে বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে স্বপ্নের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে।

"খাওয়াবে জল? তোমার কথায় যেন তেষ্টা পেয়ে গেল খুব। তবে জলই এনো কিন্তু। শরবত নয়।" বলে, কথাকে কিছুটা বিরাম দিয়ে, নীরবতার ভিতরে উভয়ের পরিসরকে ছোটো করে তারপর, জানতে চাইল পতিত: "কিন্তু হরেনদার সাড়া পাচ্ছি না! তিনি বাড়ি নেই?"

"বাবা আজ তাঁর ছোটো বোনের কাছে গিয়েছেন। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরবেন। আসুন-না ভিতরে, একটু জিরিয়েই নাহয় যাবেন।"

মাটির বাড়ির গন্ধ কি আছে এ-বাড়ির ভিতরে? "না সঞ্চিতা, এখন না। হোটেলের খাবার ফুরিয়ে গেলে আজ উপোস দিতে হবে।"

"এখন আর হোটেলে গিয়ে কাজ নেই আপনার; বরং আমার এখানেই দু-মুঠো খেয়ে নেবেন চলুন।"

"না না। সে হবে অন্য একদিন। দু-মুঠো নয় একেবারে ভরপেটই খেয়ে যাব। এখন চটপট এক গ্লাস জলই খাওয়াও বরং! তাড়াতাড়ি বিদেয় হই।"

সঞ্চিতার আন্তরিকতায়, না কি সোহাগপনায়, কে জানে, পতিতের বড়ো লোভ হয়েছিল ভিতরবাড়িতে গিয়ে একটু যত্নআত্তির মধ্যে দুটো ডালভাত মেখে খায়। লোভ হয়েছিল আদর-মাখানো শৈশবের সেই দিনগুলোকেই হয়তো ফিরে পেতে, যখন গ্রীষ্মছুটির দুপুরে মা টক আমডালের সঙ্গে মুসুরডাল-বাটা গরম গরম বড়া ভেজে খেতে ডাকতেন। তখনও এ-অঞ্চলে কারেন্ট ছিল না। যতক্ষণ খাওয়া চলত ততক্ষণ টানা হাতপাখা দিয়ে মায়ের বাতাস করা চলত। কিন্তু না, হরেনদা কিংবা মৃণালের অবর্তমানে তার মতো অবিবাহিত বাউন্ডুলের এ-বাড়িতে খাওয়া তো দূরের, প্রবেশ করাটাও গর্হিতের। এই-যে এতক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটার সামনে, হয়তো সেইটে লক্ষ করে কেউ গল্প করতে চাইবে হরেনদা কিংবা

মৃণালের সঙ্গে, আর তাতে যে অন্য এক গল্প ক্রমশ মফস্‌সল পাড়ার অলিগলি, ঘরবাড়ি, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে গেরস্থ গিন্নিদের আসরে মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে সাদাসিধে মেয়েটার তলে তলে সর্বনাশই করে বসবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে কোনো?

রায়বাড়ির পলিদিকে নিয়ে এমনই এক গল্প চাউড় হতে হতে এ-পাড়া ছেড়ে গোটা মহল্লায়, এমনকী রাষ্ট্র হয়ে গেছিল মহল্লার পরিধি ছাড়িয়ে আরও আরও দূরের লোকালয়ে, চাইকী উপকণ্ঠের বস্তিগুলোতেও। সেইসময় পতিত দেখেছে, পলিদি একা একা যখন কোনো কাজে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, একখানা ছাতার নীচে যথাসম্ভব ঢেকে নিয়ে চলত নিজেকে। কিন্তু সে-সত্ত্বেও পথচলতি নানা মন্তব্যর থেকে রেহাই ছিল না। লোকে বলাবলি করত, "মাইয়াটা অর বাপের হার্টঅ্যাটাকের পর থিক্কা পেরাইভেট অফিসের এম.ডি না কি ছাই এক হোমরাচোমরার লগে পেরায় ঘুইরা বেড়ায়। কাম দিবার নাম কইরা ফুসলাইয়া সে-শালার-মাগিবাজটা মাইয়াটারে একেবারে চুইষ্যা চিবাইয়া ছিবড়া করায় ফেলছে।"

শুনে, পতিতের কষ্ট হতো বড়ো। কথাগুলো শুনে শুনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দুলে যেত সে। পলিদি শেষমেশ এমন হতে পারল?

তার থেকে বছর দুয়েকের বড়ো পলিদিদের বাড়িতে প্রায়শ যাতায়াত ছিল পতিতের। দেখতে ফরসা বা ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও এমন কিছু-একটা ছিল ওর মধ্যে যে, শরীর তোলপাড় করে হুহু-করা এক ভালো-লাগা পাথরের মতো চেপে বসত বুকের উপর। একদিন অসতর্কে পলিদিকে ঊর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলেছিল পতিত। তারপর দিনে-রাতে জেগে বা ঘুমিয়ে কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াত পলিদির সেই অর্ধনগ্ন অপরূপ। মনে হতো তাকে যেন ইশারায় ডেকে চলেছে; বলছে: "কীরে, কী পেতে চাস আমার থেকে, কী নিবি তুই?" কিছু অবশ্য চাওয়া হয়নি পতিতের। কিন্তু কিছুই কি ছিল না চাইবার? না কি চাওয়া-পাওয়ার মনুষ্যস্বভাবে নয়, মনুষ্যেতর নিয়েছিল কিছু? হ্যাঁ, নিয়েই তো ছিল। চক্ষুশূল। আজও সেই শূল চাগিয়ে উঠে তার চোখ দুটোকে অন্ধ করে যেন হাতড়ে হাতড়ে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে বলে, আর যখনই ধরে উঠতে চায় অবলম্বন কোনো, টের পায় চারপেয়ে কোনো শাবকের মতো ঘষটে ঘষটে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে সে।

"কী ভাই, তোমাকে প্রায় দেখি খেলাধুলা ছেড়ে এই বিকেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক এখেনে! কী ব্যাপার?" পতিত দেখল খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি নিয়ে নন্দদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আলাপ হয়নি বটে, কিন্তু পথেঘাটে কতবার দেখেছে ওঁকে। সামনের বাড়িতেই থাকেন।

"ও কিছু না" বলে সটকে পড়তে চেয়েছিল পতিত। কিন্তু খপ করে হাত ধরে ফেললেন নন্দদা, "উঁহু, উত্তর না পেলে ছাড়ছি না। চলো, ভেতরে চলো।"

"ভেতরে কেন?" প্রশ্নটা ভয় আর সংকোচ থেকে করলেও, মনে মনে পতিতের অনেক দিনের একটা ইচ্ছেও ছিল বাড়িটার ভিতরে যাবে। এ-বাড়িতে আর কে কে থাকে সেও অজানা নয় তার। জানবারই কথা, কারণ সত্যিই তো এখানে সে প্রায়শ এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ লুকিয়েচুরিয়ে, নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে। এইটেই ভেবে এসেছে যে, নিশ্চয় কেউ দেখতে পায়নি তাকে। কিন্তু আজ বোধহয় অন্যমনস্কতায় একটু বেশিই প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। বাড়িটার ভিতর থেকে সেতারের অসামান্য ধ্বনিমূর্ছনা হয়তো তাকে বেশিরকমের তোলপাড় করে তুলেছিল। পতিতের থেকে বয়েসে সামান্য বড়ো পলি নামের মেয়েটিই যে বাজায় সে-যন্ত্র, সে-কথাও বিলক্ষণ জানা ছিল তার। মেয়েটিকে সেতার কোলে রিকশায় মাঝে মাঝেই চক্কোত্তিপাড়ার দিকে যেতেও দেখত সে।

"সেতার শুনতে খুব ভালো লাগে বুঝি?"

"অ্যাঁ! হ্যাঁ।" জবাবটা থতমত ভাবের সঙ্গে আপনেই বেরিয়ে এল মুখের থেকে।

কী করে জেনে ফেলেছেন নন্দদা? উনি কি তবে মুখ আর হাবভাব দেখে মনের কথা বলে দিতে পারেন? ঠিক তখুনি পতিত দেখল শুকনো পাতার উপর দিয়ে একটা বড়ো দাঁড়াশ সাপ বাড়িটার বাগান থেকে বেরিয়ে নেমে এল পথের উপরে। সাপটা নন্দদার পিছন দিয়ে যেতে যেতে সামান্য থমকে দাঁড়াল। পতিত "সাপ" বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই নন্দদা বলে উঠলেন, "ও কিছু না। বিষ নেই। কামড়ে সামান্য জ্বরজ্বালা হতে পারে, তার বেশি

নয়। চলো, লুকিয়ে লুকিয়ে শিল্পীকে না শুনে খোদ সামনাসামনি বসেই বরং বাজনা শুনবে তার।"

সেই হাত-ধরা অবস্থাতেই নন্দদা পতিতকে নিয়ে প্রবেশ করল বাড়িতে। আশ্চর্য, সাপটাও ঘুরে অনুসরণ করল। পোষা না কি?

নন্দদা বললেন, "বাস্তু সাপ। বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তোমাকে নতুন বুঝেই হয়তো জরিপ করতে এসেছে। অথবা তোমার মতো এটা হয়তো ওরও সেতার শোনার সময়। তবে লুকিয়ে লুকিয়ে না। ওই-যে ঘরের লাগোয়া কাঁঠাল গাছ আর জানালা-ঘেঁষা ডাল, ওই ডালে শরীর পেঁচিয়ে দিব্যি লেজ ঝুলিয়ে ও বাজনা শোনে রোজ। মাথাকে এদিক থেকে ওদিকে দিব্যি দুলিয়ে দুলিয়ে।"

অন্য কেউ ছবিটা কল্পনা করে অবিশ্বাসীই হয়ে উঠতে চাইবে। কিন্তু ঠাকুমার থেকে শোনা এক জোড়া গোখরো সাপের কথা মনে পড়ে যেতে খুব-একটা অবাক হলো না পতিত। একদিন গল্পচ্ছলে সে-কাহিনি শুনিয়েছিলেন ঠাকুমা। সে-দুটোও ছিল বাস্তুসাপ। দেশের বাড়ির বাগানে ঘুরে-ফিরে বেড়াত ওরা, কখনো আবার জড়ামড়ি করে দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে রোদও পোহাত।

ঠাকুমা বলেছিলেন, "এমনকী দুধের পাত্রে দুধ কমে যেতে দেখে অনেকদিন ভেবেছি ও-দুটোতেই বুঝি ঘরে ঢুকে দুধ চুরি করে খায়।"

"সত্যি?" পতিত অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল।

"সত্যি। তবে সে অন্য সাপ। তার জন্ম আমার পেটে।"

"ধুত, তুমি যে কী হেঁয়ালি করো ঠাক্‌মা!"

"সে-সাপ হলো তোর বাপ। একদিন দেখি, রান্নাঘরের জানলার বাইরে ঘাপটি মেরে একখানা খড়ের পাইপ জানালা সামান্য ফাঁক করে দুধের পাত্রে ঢুকিয়ে চোঁ চোঁ করে টানছে।"

"তাই? খুব পেটুক ছিল বুঝি বাবা?"

"বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করে আয় কুঞ্জকে।"

ঠাকুমা বলেছিলেন, একদিন নাকি জোড়া সাপ দুটোর মধ্যে যেটা ছেলে সেটা কোথাও গিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে তিন-চারটে বেজি এসে মেয়ে সাপটাকে আঁচড়ে-কামড়ে মেরে ফেলেছিল। অনেক চেষ্টাতেও ঠাকুমা

বেজিগুলোকে নিরস্ত করতে পারেননি, এতদূর হিংস্র হয়ে উঠেছিল ওরা। সাপিনী তখন গর্ভবতী ছিল।

"তারপর?"

"তারপর বাড়ির বাগানেই গোর দিলাম ওকে।"

"ছেলে সাপটার কী হলো? ও কি ফিরে আসেনি আর?"

"পরদিন এসেছিল। ফিরে, মেয়ে সাপটাকে তন্ন তন্ন খুঁজে বেড়াল খুব। আমার ভয় ছিল রেগেমেগে ও আবার আমাদের ক্ষতি করে না বসে। জোড় হারিয়ে বাস্তুসাপও হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বেচারা যেন বুঝে গিয়েছিল সব। রাগে-দুঃখে শেষমেশ নিজের ছায়াকেই ছোবলে বিদ্ধ করতে করতে সমস্ত বিষ নিঃশেষ করে সন্ধ্যের সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরের দিন ভোরবেলা দেখি দাওয়ায় মরে পড়ে আছে।"

"মরে গেল!"

ঠাকুমা তাকিয়েছিলেন জানালার বাইরে। কোনো কথা যেন তাঁর মনের গভীর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়ে পুনরায় মনেরই ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে যেতে জানালার সামান্য দূরের নারকেল গাছটার গা বেয়ে একটা কাঠ-বেড়ালির সন্ত্রস্ত ছুটের সঙ্গে মিলে ক্রমে মিশে গিয়েছিল নারকেল পাতার আড়ালে: ঝিরিঝিরি রোদ্দুর যখন আলো-অন্ধকারের জটিল মিশ্রণ গায়ে মেখে সন্ধ্যের উষ্ণতাটুকু ছড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর। দু-পা ছড়িয়ে ঠাকুমা তখন তক্তপোশের তলা থেকে পানের ডিবেটাকে টেনে এনে পান সাজাতে লেগে গিয়েছিলেন। আর, সেই ফাঁকে কখন মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজার পাশে; বলেছিলেন: "অনেক গল্প শোনা হলো। এবারে পড়তে বসো পতিত।"

মা-র কি তাড়া ছিল কোনো? তখনও তো সন্ধ্যে ঘনায়নি তত যে, ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসে দিনকে বিদায় জানাবে! অন্যদিন তো এসময় পড়তে বসে না সে। তবু কীসের তাড়া?

"এখুনি বসছি পড়তে।" কোনো আপত্তি না-জানিয়ে মা-র কথার প্রত্যুত্তর করেছিল পতিত। কিন্তু মনে হয়েছিল সাপের কাহিনিটা যেন তখনও শেষ হয়নি। তাই ঠাকুমার দিকে ফিরে বলেছিল সে: "বাকিটুকু পরে শুনব কিন্তু ঠাক্‌মা, এখন যাই।"

"কীরে পাবন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কার সঙ্গো কথা বলিস? আমাকে যেন দেখতেই পাসনি?"

পলিদি পতিতপাবনকে 'পাবন' বলেই সম্বোধন করত। বলত, "বড়ো বিচ্ছিরি নাম রে তোর। পুরোটা এত বড়ো যে, সে-নামে ডাকতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সম্বোধন তো নয়, যেন নামজপ করছি। আবার সকলের মতো টুকরো করে যদি সামনের আধখানাতে ডেকে উঠি মনে হয় ও-নামে প্রাণ নেই কোনো।"

"আমার জন্মের আগে বাবা-মায়ের পরপর দু-দুটো ছেলে আর মেয়ের মৃত্যুতে ঠাকুমা তাঁর ইষ্ট দেবতার নামে আমার নামকরণ করেছিলেন। যদিও পরিপূর্ণ হবার দু-মাস আগে মায়ের নাড়ি ছিঁড়ে জন্মেছিলাম, তবু, কী আশ্চর্য, জন্মরুগ্‌ণ শীর্ণকায় সেই আমি শত রোগভোগেও দিব্যি বেঁচে রইলাম। অথচ বছর দুই পরে আমার যে-ভাই পূর্ণ সবল শরীরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, জন্মের মাস খানেকের মধ্যে মারা গিয়েছিল সে-ও। ঠাকুমা বলতেন, আমি নাকি তাঁর ইষ্ট দেবতার নামের জোরেই বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবও বহুদিন।"

পতিত পলিদিকে এমনভাবে বর্ণনা করে শুনিয়েছিল সেসবের, যেন ঠাকুমার দেয়া নামের জোরে কোনোদিন মৃত্যুই হবে না তার। তার প্রাণ যেন বাতাসের মতো। কখনো নিথর হয়ে, কখনো মৃদুমন্দ প্রবাহে, আবার কখনো দামাল ঝড়ের মতোটি হয়ে বিশ্বের সব কিছুকে অধিকার করে ভেসে রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডর মতোই আয়ুষ্মান।

"অ্যাই, আমার সঙ্গো এক জায়গায় যাবি? একা একা আজকাল কোথাও যেতে বড্ড অস্বস্তি হয়। রাস্তায় বেরুলে অনেকের অনেক কুকথা আর বাজে ইঙ্গিত সহ্য করতে হয়।" জানলার দিকে পিছন ফিরে পতিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সদ্য স্নান সেরে-আসা পলিদি গামছা দিয়ে ভেজা চুলের জল মুছতে মুছতে যখন কথাগুলো বলছিল, খোলা জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ঢুকে-পড়া আলোধূসরতায় মনে হলো পলিদি যেন চারপাশের অরৈখিক অন্ধকার মেখে নিরাবয়ব এক মূর্তির মতন। মূর্ত (না কি বিমূর্ত) এই ছবিটি এবং সেইসঙ্গো পলিদির দেহের থেকে বাষ্প-সিক্ত সোঁদা সোঁদা গন্ধের আবহ তাকে বাক্‌রহিত

ও নিস্পন্দ করে তুলেছিল।

"কীরে! চুপ হয়ে আছিস যে বড়ো?" প্রশ্নটা করতে করতে জানালার সামনের চেয়ারে বসে পলিদি এবার সরাসরি তাকাল তার দিকে।

পতিত দেখল, একটা পীতবর্ণের হুলো বিড়াল জানালার গ্রিল গলে উইন্ডোসিলের উপর এমনভাবে এসে দাঁড়াল যে, ওর লোমশ শরীর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ গ্রিলের লোহাগুলোকে দুমড়েমুচড়ে ঝুঁকে-পড়া এক ধূসর ছায়ার ভিতরে টেনে নিয়েছে। বেড়ালটা ওর লেজকে সামান্য এপাশ-ওপাশ আন্দোলিত করে মিহি 'মিয়াঁও' রব তুলে পলিদির কোলের উপর লাফ দিল, আর তারপর, সামনের থাবার নখগুলোকে বের করে আঁচড়ে আঁচড়ে পলিদির দু-পায়ের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুকে কিছুটা বিস্তৃত করে নিতে পেরে একবার দুইবার তিনবার ঘুরপাক খেয়ে পলিদির কোলের আঁচলে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দিল।

পতিত বলল, "সত্যি, তোমাকে নিয়ে আজকাল পাড়ায় নানান কথা হয়। আমার খারাপ লাগে খুব।"

"জানি। কিন্তু কী করব বল। বাবার অসুখের পর থেকে সংসার যে কী করে চলছে! একটা চাকরির ভীষণ দরকার। নইলে বাবাকে বাঁচাব কী করে? যে-মানুষকে নিয়ে আমার নামে এত গল্প পাড়ায়, সেই মানুষটি তবু তো একটা আশা দিয়েছেন। এই দুঃসময়ে কোম্পানির থেকে কিছু টাকারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।" একটু চুপ থেকে বেড়ালটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে পলিদি বাকি কথাটা শেষ করল: "ওঁর কাছেই যাব আজ। হয়তো কম্প্যাশোনেট গ্রাউন্ডে চাকরিটা হয়েও যেতে পারে।"

শুনতে শুনতে পতিতের মনে পড়ে গেল নন্দদার কথা। নন্দদা থাকলে পলিদিকে এমন পরিস্থিতিতে হয়তো পড়তে হতো না। বছর তিনেক হলো হঠাৎ কীভাবে যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল পলিদির দাদা তার হদিশ আজও পর্যন্ত পুলিশ দিতে পারল না। পুলিশের ধারণা, নন্দদা কোনো নকশালপন্থী দলে ভিড়ে বনে-জঙ্গালে আত্মগোপন করে আছে।

ওকে নিয়ে অবশ্য আরও বহু কাহিনি চাউর আছে পাড়ায়। নাটকের রিহার্সালের ফাঁকে হরনাথই বলেছিল একদিন, মুসলমান পাড়ার আয়েশার সঙ্গো ভাব-ভালোবাসা ছিল নন্দদার। সেই সম্পর্কের জেরে আয়েশার পেট হয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে বিয়ে করার নামে নন্দদা ঘর থেকে একদিন বের

করে আনে ওকে। তারপর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে খুন করে বিলের ধারের বড়ো কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। ইদানীং পলিদির কেচ্ছার গল্পের সঙ্গো মিলিয়ে-মিশিয়ে এ-পাড়ার কিছু কিছু মানুষ হরনাথের সেই পুরোনো কথাটাকে চাউড় করতে লেগেছিল। কিন্তু মুসলমান পল্লির লোকেরা সদলবলে প্রতিবাদ করায় কথাটা তখনকার মতো কানাঘুসোর বেশি প্রচার পাবার জুতসই অবকাশ পায়নি। পলিটিক্যাল হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে এতদিন হরনাথ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরাই গলা টিপে কথাটাকে আধমরা করে সযত্নে ফেলে রেখে দিয়েছে। তবে প্রয়োজনে ওষুধ-পথ্যি দিয়ে সেবা-শুশ্রূষায় ফের তাকে জলজ্যান্ত করে তোলার কোনো সুযোগ যে হাতছাড়া হতে দেবে না, তা হলফ করেই বলা যায়। মানুষের ঝোঁকই হলো সত্যের থেকে মিথ্যেকে বেশি বেশি বিশ্বাস করা। তাই ফন্দিফিকির ছাড়া পলিটিক্সে দ্রুত সাকসেস পাওয়া যে কঠিন, হরনাথের চেয়ে এ-ব্যাপারে এ-তল্লাটে আর কেই-বা তা ভালো জানে?

পলিদির সঙ্গো সেদিন পতিত সেই অফিসে গিয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষার পর অফিসের ভিতর থেকে করিডর পেরিয়ে একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোকের সঙ্গো হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিল পলিদি। সেই হাসি দেখে পতিতের সেদিন কেন জানি ভীষণরকম রাগ হচ্ছিল। মনে মনে চেয়েছিল চাকরিটা যেন কোনোভাবেই না হয়। কিন্তু পলিদি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলল, "হয়ে গেল রে চাকরিটা। স্যারই বন্দোবস্ত করে দিলেন সব।" পতিতের বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই সেই লোক যাকে নিয়ে পলিদিকে জড়িয়ে পাড়ায় হাজারো কেচ্ছার ফিরিস্তি। চোখে-চশমা স্বল্প-টাক লম্বা ফরসা লোকটি এগিয়ে এসে তার সঙ্গো হ্যান্ডশেক করে জানতে চেয়েছিল কী করে সে। পতিত তখন কী-যে প্রত্যুত্তর করে সেখান থেকে তড়িঘড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, তা আজও মনে করতে পারে না। অথচ সেইদিন তার সামান্য কিছু পরেই যা যা ঘটেছিল সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে। স্মৃতিরা কি ঘটনার লঘু-গুরু বিচার করে মস্তিষ্ককোষে লিপিবন্ধ হয়ে চলে? স্মৃতির মস্তিষ্ক-প্রকোষ্ঠে সেইসব লঘু-গুরু বিচারেরও কি আছে মাপন-যন্ত্র কোনো?

"চল, আউট্রামঘাট থেকে সরাসরি বাড়ি যাবার বাস ধরি। কতদিন গঙ্গা

দেখি না, এই সুযোগে সেই ইচ্ছেটাকে মিটিয়ে নেয়া যাবে। আচ্ছা, তুই কখনো বিকেলের আউট্রামঘাট দেখেছিস রে পাবন?" চাকরিটা হয়ে যেতে পলিদি কি একটু বেশিই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? ভাবল পতিত।

"দেখেছি।" উত্তরটা বড়োই সংক্ষিপ্ত আর দায়সারা হলেও সেটা পলিদির চাকরি পাওয়ার কারণে যতটা নয়, তার থেকে অনেক বেশি ঘৃণায়- লজ্জায়- অপমানে। কেননা পতিত শুনতে পেল সে-মুহূর্তে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে দু-জন ধোপদুরস্ত যুবক পরস্পরকে বলছে: "উফ্ ! কী ঝাঁঝ রে মাইরি!" "যা বলেছিস, বেচারা ছেলেটা পুড়ে না মরে!"

"একা এসেছিলি, না কি মেয়ে-বন্ধু ছিল সঙ্গে?" পলিদি এমন অবলীলায় প্রশ্নটা করল যেন ওই যুবকদের কথা কানেই যায়নি।

"একাই। তাছাড়া, আমার কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই।" পতিত কতক রুক্ষ কতক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিল।

"বাব্বা, খুব রেগে আছিস মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি কি বন্ধু নই তোর?"

প্রশ্নে চমকে উঠেছিল পতিত। তাই তো, পলিদি তার কাছে ঠিক কী। এই-যে এতদিনের সম্পর্ক, তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে সে? যতই নৈকট্য বোধ হয় তত যেন সম্পর্কটা কেবলই দূরে, আরও দূরে সরে সরে যায়। পলিদিই-বা কেমন চোখে, কোন্ সম্পর্কে তার সঙ্গে মিশে এসেছে এই কয় বছর? দিদির মতো স্নেহশীলতায়, না কি বন্ধুর মতো সহমর্মিতায়? এইমাত্র নিজেকে মেয়ে-বন্ধুর উপমায় টেনে এনে আসলে কী বোঝাতে চাইল পলিদি?

"তোকে আজকাল একটা কথা বলতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু বলতে পারি না। কথাটা শরীরে-মনে তোলপাড় করতে করতে গলার কাছে এসে আটকে গিয়ে বিষম-টিষম লেগে আবার ঢোঁক-গেলার মতো পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। প্রতিদিনই মনে হয় আজ নিশ্চই পারব, কিন্তু সেই আজটাকে ধরতে গেলেই ফুরুত করে উড়ে পালায়।"

মেঘের আড়াল থেকে এক চিলতে পশ্চিমে-আলো পলিদির খোঁপার বাঁধন চুঁয়ে চুঁয়ে মুখমণ্ডলের নানা খাঁজের ভিতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ক্রমশ শরীরের আনাচে-কানাচে হারিয়ে গিয়ে যেন-বা শিহরন আর কুণ্ঠা হয়ে ভাটার টানে চলা ছোটো ছোটো ঢেউগুলোতে মিশে যাচ্ছিল। গঙ্গার ঘোলাটে কুসুম জল ক্ষণে ক্ষণে রং পালটে নিজেকে মেঘের মতোই করে তুলছিল ধূসরাভ।

"ঠিক এই মুহূর্তে কি কথাটা বলে উঠতে পারবে? মনে হচ্ছে তোমার?" পতিত 'মুহূর্ত' এবং 'তোমার' শব্দ দুটির উচ্চারণের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে আরও বুঝি নিকটবর্তী হতে চাইল পলিদির। আর ঠিক তখনই, গঙ্গার ছোটো ছোটো ঢেউ হালকা কালো আলোর রেখা হয়ে পাড়ে এসে বাড়ি খেয়ে পড়ছিল, এবং এইভাবে বাড়ি খেতে খেতে চারপাশের মুহূর্তগুলোকে নিয়ে হঠাৎ করে ছেড়ে চলে গেল শেষবেলাকার বিকেলের ঐশ্বর্যটুকু। ওপাড়ে ঘনিয়ে-ওঠা অন্ধকার অনেক অনেক কথার নীরবতা নিয়ে থম মেরে ছিল— এমনটা আজও কেন মনে হয় তার?

"জানি না। চল ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসি একটু। সন্ধ্যের প্রতীক্ষাটুকু আমার ভিতর থেকে যদি সে-কথাটাকে মুক্ত করে আনতে পারে তখন নাহয় বলব তোকে সব!"

প্রতীক্ষা। কী আশ্চর্য এক অবলম্বন মানুষের জীবনে! স্বীকৃতির মতো। জীবনভর মিশে থাকে সময়ের গভীরে, আলস্যে, প্রতিটি দিনের বেঁচে-থাকার রহস্যের ভিতরে।

কিন্তু সন্ধ্যে নামার অপেক্ষাটুকুর মধ্যেই আচমকা শুরু হলো মুষল বৃষ্টি। কোনো আশ্রয় খুঁজে নেবার আগেই দু-জনকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিল তা। সেই ভেজা শরীরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বোবাই হয়ে গিয়েছিল তারা। একটা শিরিষ গাছের ডালে কেমন করে যেন পলিদির শাড়ির আঁচল জড়িয়ে গিয়েছিল। পতিত সেই আঁচলের জড়ানো প্রান্তকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেকেই কখন জড়িয়ে ফেলেছিল সেই আঁচলে। সে ছিল পতিতের কাছে কোনো নারীশরীরের প্রথম স্পর্শ। তারপর সে-ই, নাকি পলিদি— কে যে কাকে কীভাবে কতটুকু পরস্পরের প্রশ্রয়ের কাছে সঁপে, কিংবা হয়তো ক্রমশ ভিজে-যাওয়া শরীরের শীতার্তিতে উভয়কে আশ্রয় করে পেতে চেয়েছিল ঘুম বা স্বপ্নের আবিলতা, বা প্রবহমাণ ওই গঙ্গার থেকে ধেয়ে-আসা বাতাসের সাবলীল আহ্লাদটুকু— সে-কথা ভবিষ্যতে কখনো পরস্পরের কাছে জেনে নেবার ফুরসত পায়নি। আজও সেইসব মুহূর্তরা কিংবা একটিই মাত্র মুহূর্ত হয়তো— প্রতীক্ষাজ্ঞানে পতিতের দেহে-মনে বিস্ময় হয়ে জুড়ে আছে। কেননা সেটাই ছিল ওদের দু-জনের অন্তিম সাক্ষাৎ, ছিল পলিদির থেকে পতিতের শোনা শেষ বাক্যবন্ধ: '··· তখন নাহয় বলব তোকে সব'।

সেদিন বাড়ি ফেরবার পর ভয়ংকর জ্বরের আক্রমণ পতিতের শরীরে

দুরারোগ্য টাইফয়েড সংক্রামিত করে দিয়েছিল। প্রায় দেড় মাস পরে যেদিন আবার সে দুপুরবেলায় স্নানশেষে চারা পোনার ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে ডায়রি লিখবে মনে করে বসেছিল চেয়ার-টেবিলে, মা এসে জানিয়েছিল পলিদির বাবার মৃত্যুর খবর, বাড়ি বিক্রি করে মাসিমাকে নিয়ে পলিদির কোথায় একটা চলে যাবার খবর। মায়ের থেকে সেইসব শোনার পর পতিত থম মেরে গিয়েছিল, মনের ভিতরে উজিয়ে-ওঠা নানা প্রশ্ন নির্বাক করে তুলেছিল তাকে। পতিতকে এড়িয়ে, এমনকী বিদায় নেবার মতো সামান্য সৌজন্যটুকু পর্যন্ত না-দেখিয়ে পলিদি কি শেষপর্যন্ত ওই লোকটার কাছে বিক্রি হয়ে গেল? এক সমর্পিত আশ্রয়ের নিশ্চিন্ততাকে অবলম্বন করে নিতে? সেদিন কি তবে এই কথা ক-টাই বলতে চেয়েছিল পলিদি? বলতে চেয়েছিল ভুলে যেতে ফেলে-আসা দিনগুলোর ভালো-লাগা, আবেগ, বিশ্বাস আর সম্পর্ক? না কি এইসব ভাব-ভাবনা আসলে পতিতের কষ্টকল্পনা? আসলে অন্তস্তলে প্রবাহিত আক্ষেপের চোরাস্রোত কোনো?

"কী হে পতিত, অসময়ে যাও কই?" মনোতোষদার প্রশ্নে থমকে দাঁড়ায় পতিত। ঘুরতে ঘুরতে কখন পলিদিদের বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে সে। অবশ্য মনোতোষদাই এ-বাড়ির মালিক এখন। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে পালিয়ে এসে নেহাতই নগদ টাকার জোরে লোকটা কিনে নিয়েছিল বাড়িখানা। হরেনদার মায়ের দিককার কেমন এক আত্মীয়ও হয় মনোতোষদারা। হরেনদার বাবা নৃপতি চৌধুরিই ছিলেন এই বাড়ি কেনা-বেচার মধ্যস্থতাকারী।

"একটু কাজ ছিল এদিকে। তা, আপনি কোথার থেকে?" পতিত সৌজন্যবশত জিজ্ঞাসা করে।

"আইর বলো ক্যান, আইজকাল ব্যাঙ্কের হাজারো ফিরিস্তি। কে.ওয়াই.সি না ছাতার কী একখান ফর্মে ঠিকুজি-কুষ্ঠি সব জমা কইরা আইলাম। তাইর ওপর ফিফটিন এইচ। শালার মহাজনি কারবার খুইলা বইছে তোমাগো গরমেন্ট। এম্‌নিতে তো থাকো খাও হাগো মোতো সবেতেই হয় ট্যাক্সো ভরো, নয় সার্ভিস চার্জ। দিবি তো জমা টাকায় দু-আনা সুদ। তাইতেও শালার কী এত্ত ট্যাক্সো মারাও শুনি? ওদিকে ব্যাপারীরা যে তোর আমার চোদ্দো পুরুষের পিছন মাইরা সোনাদানা গাড়িবাড়ি কইরা দিব্যি আছে, তাইর বেলা তোগোর গরমেন্ট কি কানা, না আঁখ-দুটাতে ন্যাবা লইয়া বইসা আছে?"

"ছাড়ুন দাদা। মেনে নেয়া ছাড়া কী-ই আর করবেন বলুন?" কথাটা সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলতে বলতে পতিতের তবু ওর কাছে জানতে ইচ্ছা করে গভর্নমেন্ট যদি মনোতোষদার না হয়ে আর সকলেরই হবে তাহলে লোকটা ধরে-করে একখানা সরকারি স্কুলে কেরানির চাকরি জুটিয়ে এতকাল কার চাকুরি করল, আর এখন কারই-বা পেনশনের টাকায় এত তড়পায়।

"এই ছাইড়া-ছাইড়াই তো সব কিছু উচ্ছন্নে যাইতাছে। ছোটোমাইয়াটার কারণে তোমাগো প্রদীপ মাস্টাররে ঘরদোর, এমনকী ইস্কুলের চাকরিখান পর্যন্ত ছাইড়া কোথায় নিরুদ্দিশ হইয়া যাইতে হয়। বিপিনের বউডা পলায় যায়। তোমাগো পলিদি এক বুড়ার রক্ষিতা হইয়া থাকে। সেদিন মেট্রো কইরা যাইতাছি, দেখি, এখনও সে দিব্যি রংচং মাইখ্যা চেহারাখানরে বেশ ঝাড়পোছ

দিয়া পাকা ডালিমটির মতো কইরা রাখছে। কথা কওনের ফুরসুত না দিয়া শুভাবাজার ইস্টিশানে ট্রেন থিক্কা নাইম্‌মা গেল।”

পলিদির কথায় পতিত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ মেরে গেল। সেই ফাঁকে কখন সন্ধ্যের অন্ধকার ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে চারপাশ টেরও পায় না সে।

“আরে পতিতপাবন, অন্ধকারে অমন বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? চলো, ভিতরে চলো।” মেসোমশাই, মানে পলিদির বাবা পতিতের পিঠে হাত রেখে দাঁড়ালেন। মেসোমশাই মাঝে-মধ্যেই পতিতের পুরো নাম নিয়ে থাকেন। ওই নামে ডাকলে নাকি তাঁর ঈশ্বরের স্মরণ নেয়া হয়ে যায়। কথায় কথায় বলেন: “সবই হলো গিয়ে বিশ্বেস। বুঝলে বাবা সাধে কি মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর?”

তর্ক করা তো দূর, কোনোদিন প্রকাশ্যে কারও কথার বিরুদ্ধ কথা বলার ইচ্ছেটুকুতেও জোর পায় না পতিত।

“না মেসোমশাই, আজ থাক, কাল নাহয়...” পতিত বলল।

“ম্যাক্সিমাম হাফ অ্যান আওয়ার, তোমাকে দারুণ একটা খবর দেবার ছিল।”

মেসোমশাইয়ের অমন আবেদন ফেরাতে পারে না সে। বলে, “আচ্ছা, চলুন, তবে আধ ঘণ্টাই কিন্তু।”

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় পতিত। “তুমি বোসো, আমি চটপট বাইরের পোশাকটা ছেড়ে গা-হাত-পা ধুয়ে আসি।” তারপর একটু উচ্চস্বরে “ও পলির মা, শুনছ? পতিত এসেছে। আমাদের জন্য একটু চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করো তো ঝটপট!” বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে চলে যান মেসোমশাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা আর মুড়িমাখা নিয়ে স্বয়ং পলিদি হাজির। পলিদি বাড়ি থাকলে মাসিমাকে কক্ষনো এ-ঘরে বেরুতে দেখেনি পতিত। মাসিমার মতো এত স্বল্প কথার মানুষও প্রত্যক্ষ করেনি সে। মেসোমশাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ পর্যন্ত মাসিমার সঙ্গে ক-টা কথা হয়েছে তার, অনায়াসে বলে দিতে পারে সে।

“পলি, তুই ভিতরে যা। পতিতের সঙ্গে আমার একটু পার্সোনাল কথা

আছে।” মেসোমশাই বলে ওঠেন।

“তোমার পার্সোনাল কথা তো বাবা— সব জানি আমি।”

“কী জানিস তুই?”

“এই, যে, তুমি আর চাকরি-বাকরি করবে না। একটা দারুণ বিজনেস শুরু করবে শিগগির। সবই ঠিক হয়ে আছে, শুধু শুরুটা করলেই হয়।” পতিত লক্ষ করল, মেসোমশাই কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে পলিদির মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। আর ঠিক তখন, মেসোমশাইয়ের পিছনদিককার ছাদের সিলিং-ঘেঁষা ঘুলঘুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে একটা টিকটিকি খপ করে একটা উচ্চিংড়েকে গিলে ফের ঘুলঘুলিতে সেঁধিয়ে যেতে যেতে ‘ঠিক ঠিক’ করে দু-বার ডেকে উঠল। অবশ্য সেই আওয়াজ যে ওই টিকটিকিটারই গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটা হলফ করে বলতে পারবে না সে।

“কে বলেছে তোকে এইসব?” একটু কি বেতালা হয়ে গেল মেসো-মশাইয়ের কণ্ঠস্বর?

“কেন? তুমিই তো!”

“বলেছি বুঝি?” গলে গেলেন মেসোমশাই। ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসি। “তাহলে তুইও বোস। হ্যাঁ হে পতিতপাবন, সবই তো শুনলে পলির মুখে! এখন তোমার কী মত।”

“কোন্ সব মেসোমশাই? কীসের ব্যাবসা সেটাই তো জানলাম না।” পতিতের সত্যিই সত্যিই যাকে বলে সসেমিরা অবস্থা।

“একেবারে নতুন ধরনের। সময় নিয়ে কারবার।”

“সময়!” সবিস্ময় প্রশ্ন নিয়ে পতিত তাকাল পাশে-বসা পলিদির মুখের দিকে। দেখল, পলিদির ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসির টুকরো। সেই হাসিতে মনে হলো খুশি হতে-পারার মতো অবলম্বনটুকুও নেই। সারা ঘরে ফ্যানের ধাক্কায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে-বন্ধ-বাতাস, সেই বাতাসের সোঁ-ও-ও শব্দ পতিতের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কেন জানি সেতারের রিনরিন ধ্বনির মতো বেজে উঠছিল। পলিদিকে এড়িয়ে তার চোখ চলে গিয়েছিল ঘরের কোণে পড়ে-থাকা সেতারটার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তার গায়ে ধুলোর পুরু আস্তরণ। কতদিন সেটা বাজায়নি পলিদি? কতদিন সাপ এসে বসেনি ওই কাঁঠালের ডালে?

“বুঝলে না, তাই তো? আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোনো।” নীরবতার

ভিতর পতিতের প্রশ্নকে থিতিয়ে যেতে না দিয়ে মেসোমশাই কথা শুরু করে এক ফাঁকে একখানা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন, "ধরো, তোমার মা-র কোনো-এক জায়গায় বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে বা প্রয়োজন, কিন্তু বাড়িতে কারোই সময় নেই তাঁকে সেখানে নিয়ে যায়। আমরা তোমাদের কাছ থেকে একটা ফি নিয়ে সেই জায়গার থেকে সযত্নে ঘুরিয়ে আনব তাঁকে। আবার ধরো, তোমার মাসিমা সিনেমা দেখবেন, কিন্তু অ্যাডভান্স টিকিট কেটে দেবার কেউ নেই। আমরা টিকিট কেটে রিকশায় চাপিয়ে হলে নিয়ে যাব, আবার শো ভাঙলে রিকশায় করে বাড়িতে পৌঁছেও দেব। কেবলমাত্র টিকিট কেটে দেবার জন্য একরকম চার্জ, আবার যাতায়াতসুদ্ধ সবটা চাইলে আরেক রকম চার্জ। কেমন, ভালো না আইডিয়াটা?"

"কিন্তু এসব কাজে তো অনেক লোকবলের দরকার। তাছাড়া এমন কাজের ডিমান্ড আছে কি না সেটাও তো খতিয়ে দেখা চাই।"

"কেন? দেশে কি বেকার কম্‌তি আছে? আর, ডিমান্ড-এর কথা বলছ? সাপ্লাই দিয়ে কূল পাওয়া যাবে না। তোমাকে কিন্তু আমি অলরেডি রিক্রুটমেন্ট অফিসার ভেবে রেখেছি। এখন ঝটাপট সংস্থার একটা জুতসই নাম ভেবে ফেলো দেখি। আরও বহু প্ল্যান ঘুরছে মাথায়। সব একে একে বলছি তোমাকে। একটু ধৈর্য ধরো শুধু।" বলে, মেসোমশাই পলিদির দিকে ফিরে বললেন, "অ্যাই পলি! যা তো কড়া করে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খানকতক পেঁয়াজি ভেজে নিয়ে আয় তো।"

"তুমি ওর সামনেই আজ বোতল খুলে বসবে নাকি?"

"বসব কীরে! চাইলে ওকে ভাগও দিতে পারি। দু-দিন বাদে যে-ছেলে চাকরি করবে সে মাল খাবে না তো কি দুধ খাবে? তোকে যা বলছি তাই করগে যা। মাস্টারি ফলাসনে।"

দশ মিনিটের মধ্যেই পেঁয়াজি আর বোতল এসে গেল টেবিলে। কিন্তু পলিদি আর বসল না। গ্লাসে বাংলা ঢেলে চুমুক দিতে দিতে মেসোমশাই ফের বলতে শুরু করলেন, "বুঝলে পতিত, এ-শালার চাকরিতে না ঘেন্না ধরে গেছে। যত কাজই করি, ম্যানেজার তবু না-খুশ; হয় বলবে কামচোর, নয় অপদার্থ। আরে, তুই-যে জরুরি কাজের নাম করে অফিস ডুব মারিস, একে টুপি ওকে ঢপ মেরে নিত্যি লোমের বক্তৃতা ছোটাস, সেটা কি জনগণ বোঝে না ভেবেছিস? সবাইকে গান্ডু ভাবিস? না তোর বাড়ির চাকরবাকর?

সেদিনের ছোকরা, আমি হলাম তোর বাপের বয়সি, আমাকে বলিস কাজ বুঝি না? ফাঁকি মারি? হারামির হাতবাক্স শাল্‌-লা!" সামান্য থেমে, গেলাসে একটা বড়ো চুমুক মেরে এবারে যেন হৃদয়ের খুব গভীর থেকে বলে ওঠেন, "না হে, ব্যাবসাটা খুব শিগগিরই শুরু করতে হবে। যত ধাপ্পাবাজেরা যদি মালা-তাবিজ-আংটি বেচে দিব্য কামিয়ে বাড়ি-গাড়ি করতে পারে, আমরা সেবা বেচে দু-দশ কামাতে পারব না? এ তো আর লোক-ঠকানো না, বা ইধার কা মাল উধার না, যে, পাপ হবে। তুমি বলো, আছ তো আমার সঙ্গে?"

পতিত বুঝে উঠতে পারে না কী জবাব দেবে সে মেসোমশাইকে।

"চুপ করে বসে আছ কেন? মাল না খাও, পেঁয়াজি খেতে আপত্তি কীসের? বড়ো ভালো বানিয়েছে কিন্তু পলি। নাও নাও, আরও দু-খান নাও দেখিনি। দাঁড়াও, পলিকে আরও ক-টা বরং ভাজতে বলে আসি।"

পতিত সজোরে আপত্তি করে উঠল।

দোকানদার বলল, "কেন দাদা, রান্না কি ভালো হয়নি আজ? সব ভাত পড়ে আছে পাতে। মৌরলা মাছের চচ্চড়ি বানিয়েছি। বলব দিতে?"

পতিতের সামনে কাত্যায়নী হোটেলের মালিক বিষ্ণুচরণ সামন্ত, সকলের বিষ্টুদা, দাঁড়িয়ে।

"না না বিষ্টুদা, রান্না খারাপ হবে কেন? গরমে একদম রুচি নেই খেতে।" পতিত জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখের ভিতরের দলাটাকে কোনোক্রমে গিলে নিয়ে বলল। উলটো দিকের চেয়ারে-বসা লোকটা মুঠোয়-ধরা ডিম-মাখা ভাতের গ্রাস মুখে চালান করে চিবুতে চিবুতেই তার দিকে চেয়ে সামান্য যেন হাসল মনে হলো।

"ওরে পতিতকে আমপোড়ার শরবত দিয়ে যা।" বিষ্টুদা অন্য দিকে ফিরে হাওয়ায় কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে, তারপর, ফের তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন কি আর সে-জোয়ান বয়েস আছে রে ভাই— ছাতা-টাতা সঙ্গে করে বেরুতে হয়। ফেরার সময় আর হেঁটে কাজ নেই। শরবতটুকু খেয়ে একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি যেয়ো।"

একটা মারুতি ভ্যান ঠিক তক্ষুনি দোকানের সামনে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। সকলে সচকিত হয়ে দেখল ছুট্টে রাস্তা পেরুনো হলুদ রঙের একটা

কুকুর প্রায় চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল সে-যাত্রায়। গরমটা আজ সত্যিই দিশাশূন্য হয়ে উঠেছে, ভাবল পতিত।

জ্বরের ঘোরে পতিতপাবনের ভুল-বকা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, দীপালিদির ছেলে মনোজ পাড়ার ডাক্তার অনিমেষ হালদারকে খবর দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এল। গত কুড়ি বছর ধরে এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে আসছে দীপালিদি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ধীরে ধীরে পতিতের একপ্রকার অভিভাবক স্থানীয়ই হয়ে উঠেছে সে। ডাক্তার প্রেসার মেপে, স্টেথো দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করে দীপালীদিকে বললেন, "ভাইরাল বলেই মনে হচ্ছে। এখুনি ভালো করে স্নান করিয়ে জ্বরের ওষুধ খাওয়াতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে জ্বর যেন কোনোভাবেই একশোর উপরে না যায়। গেলে, ঠান্ডা জলে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে প্রয়োজনে দিনে চার বার পর্যন্ত জ্বরের ওষুধ দিতে হতে পারে। অন্য কোনো ওষুধ এখনই দিচ্ছি না। আজই একটা রক্তের পরীক্ষা করে সন্ধ্যের পরে রিপোর্টটা আমাকে দেখিয়ে আনবেন। রিপোর্ট দেখে প্রয়োজন হলে অন্য ওষুধ লিখে দেব। বিশ্রাম আর ঠিকঠাক দেখাশোনা পেলে সাত-দশ দিনেই সুস্থ হয়ে যাবেন।"

অন্য ওষুধের আর প্রয়োজন হয়নি। ক-দিন দীপালিদির যারপরনাই সেবা-যত্ন পেয়ে পতিত অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। শুধু ভীষণই দুর্বলতা আর, খাওয়ায় কোনো রুচি নেই তার।

"শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার পরোয়া নাই, কোথায় কোথায় যে তুমি ঘুইরা বেড়াও দাদাবাবু!" দীপালিদি পতিতের হাতে দুধ-সাবুর বাটি এগিয়ে দিয়ে বললে।

"কোথায় আর যাই। কাছে পিঠেই ঘুরে বেড়াই একটু-আধটু। সারাদিন ঘরে বসে থাকতে কি ভালো লাগে? তাছাড়া চলে-ফিরে বেড়ালে শরীরটাও ভালো থাকে। নইলে অসুখে ধরে যাবে না?"

"কিন্তু পাড়ায় তোমারে লয়া কত কথা হয় জান? লোকে রটায় তুমি নাকি আদাড়ে-পাদাড়ে ঘুইরা বেড়াও আর আপনমনে ফিসফিস বিড়বিড় গুজগুজ কইরা কীসব কথা কও। আবার কখন-বা এর-ওর বাড়ির সামনে গিয়া কার-না-কার নাম ধইরা ডাক পাড়ো। তারা এও আলাপ করে, বিয়া-থা না কইরা তোমার নাকি ভীমরতি হইছে। আচ্ছা, সত্যি করে কও দেখিনি, কারে অত খুইজ্জা বেড়াও তুমি?"

"ধ্যাত, আমার কেই-বা আছে, কে হারিয়েছে যে খুঁজে বেড়াব? লোকে তোমার সঙ্গে মশকরা করে।"

"কিন্তু জ্বরের ক-দিন তুমি যেসব কথা কইছিলা সে কি মিছামিছি?"

"কী কথা?" পতিত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"সব কি লিইখ্খা রাখছি না পস্টো শুনছি, যে, অ্যাখন কমু তা? তবে যখন জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে কইতাছিলা, কে য্যানো তোমারে ছাইড়া চইল্লা গেল, কে এক তোমার লগে কোথায় একখান যাইব, আবার কে য্যানো আইবো শিগগিরি, আইস্যা বাড়িঘরের সবদিকে ঘুইরা ঘুইরা বাগানের থিক্কা কচুর শাক, লাউয়ের ডাটি, লঙ্কা তুইল্লা আইন্যা তোমারে রান্না কইরা খাওয়াইবো, তখন মনে মনে ভাবলাম আমার রান্নায় কি শেষমেশ তোমার অরুচি হইল?" দীপালিদির কথায় সামান্য দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে।

"তা কেন? ঘোরের কথার কি মানে আছে কোনো? মিছামিছি অভিমান কর তুমি!"

"তবে যে শুনি স্বপনের আন্ধারে লুকায় থাকে মাইনষের মন। সেইডা মিথ্যা?"

পতিত উত্তর খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলে, "এই ক-দিনে কি কেউ খোঁজখবর করেছিল আমার?"

"ওঃ হো, একদম ভুইল্লা গেছি দাদাবাবু। তোমার এক মাস্টারমশাই, প্রদীপ নাম— তিনি আইছিলেন। আর-একদিন রাইত নয়টা কি তারও বেশি হইব হয়তো, আন্ধারে মুখখান তেমন ঠাহর হয় নাই বটে, কিন্তু একগাল দাড়ি, উশকোখুশকো চেহারার এক মনিষ্যি আইছিল। নাম জিগাইতে কইল, দু-একদিনের ভেতর আবার আইব সে।"

অজানা লোকটির সম্পর্কে কৌতূহল হলেও পতিতের তখন নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। একটা মশা চারপাশে ঘুর ঘুর করতে করতে তার কানের পাশ দিয়ে চক্কর কেটে বসল বাঁ-গালে। অনুভূতির রেশ ধরে এক থাপ্পরে মশাটাকে মেরে ক্লান্তি যেন বেড়ে গেল তার। তাই একটু ঘুমুতে চেয়ে বিছানায় শরীরকে আরও ছেড়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল। দীপালিদি কিছুটা নিজের মনেই, কিছু আবার পতিতকে শুনিয়েই হয়তো, অনর্গল বকে যাচ্ছিল নানান সব কথা: "অ্যাদ্দিন ধইরা এ-বাড়িত আছি আমি, এই দুইজন মাইনষেরে কুনোদিন দেইখছি বলে তো মনে হয় না। মাস্টারমশাই তবু তো

নিজের নাম কলেন, তোমার খোঁজখপর নেলেন, কিন্তু ওই বেচাল মনিষ্যিটার য্যান ক্যামোন ধারা। পাইরলে জুর কইররাই ঘরের অন্দরে ঢুইক্কা পড়ে। আমার বাপু বেশ একটু ভয়ই করছিল।"

"তোমাকে কতবার তো বলেছি যার-তার ডাকে দরজা খুলবে না। দিনকাল ভালো নয়। তাছাড়া এ কি তোমাদের কলোনি পাড়া ভেবেছ যে, বিপদে-আপদে একডাকে সব জড়ো হয়ে যাবে?"

"আর ভুল হইব না।" দীপালিদি গলায় কাচুমাচু ভাব এনে বলল।

"ঠিক আছে। কিন্তু এবারে আমাকে একটু জিরিয়ে নিতে দাও দীপালিদি। আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।"

"আইচ্ছা। আমি চইল্লা যাই অনে। তাইরপর দরজা দিয়া যত্ত পার ঘুমাও। আজ পেরায় সাতদিন হইল বাড়িত যাই নাই। রাত্তিরে মনোজরে শুতে পাঠায় দিমু অনে।"

"না, দরকার হবে না তার। একা-একাই থাকতে পারব আমি।"

দীপালিদি চলে গেলে পতিত দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুল। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেও ঘুমুতে পারল না সে। অথচ কিছু আগে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল তার। অগত্যা বিছানার থেকে উঠে টেবিলের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসল। দু-তিনবার এম্‌নি এম্‌নিই ড্রয়ার খোলা-বন্ধ করে শেষে ঝুঁকে ভিতর থেকে পেন আর প্যাড বের করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হিজিবিজি কাটল। ঠিক হিজিবিজি নয়, অনেকের নাম লিখে তার উপরে কাটাকুটি। ডুডল্‌স? তা-ও যখন একঘেয়ে হয়ে পড়ল পতিত এ-ঘর ও-ঘর সারা বাড়ি ঘুরঘুর করতে করতে একসময় মা-র ঘরের চৌকিতে গিয়ে বসল। মনে করবার চেষ্টা করল মায়ের মৃত্যুর পর শেষ কবে এসে বসেছিল এই ঘরে। মনে পড়ে গেল, মায়ের জীবৎকালে যখনই আসত এ-ঘরে, কী দারুণ সৌন্দর্য আর কমনীয়তার পারিপাট্যে শান্তিতে ভরে উঠত তার হৃদয়। ঘুমে জড়িয়ে আসত দু-চোখ। আরও মনে পড়ে, অনেক বেশি বয়েসেও যখন কোনো কোনো রাতে ঘুম আসত না, চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়ত সে মায়ের পাশে; আর, কোন্-এক জাদুমন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ তার দু-চোখ জুড়ে নেমে আসত ঘুম। মা কি জাদু জানত তবে? এও টের পেত যে, ঘুম ভেঙে গেলেও মা কোনো সাড়া দিত না।

অনেক দিন পেরিয়ে আজ ফের এই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে থাকতে

থাকতে পতিতের দু-চোখে এক আবিলতা, স্নেহঘন এক সম্মোহন যেন হঠাৎ ছুঁয়ে গেল। শিরশির করে উঠল স্নায়ুতন্তুগুলো। চারপাশে তাকিয়ে দরদি এক সুখানুভূতি রম্ভন করতে করতে দীপালিদিকে তার ভারি প্রশংসা করতে ইচ্ছে হলো। সত্যি, ঘরের অন্তর্মহল জুড়ে বিরাজ করতে-থাকা সেই পুরোনো সৌন্দর্যকে আজও সে তিলমাত্র নষ্ট হতে দেয়নি। এমনই বিনম্র যত্ন-আদরে পরিচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে সবটুকু যে— ঠাকুরের আসন থেকে মায়ের বাক্স-প্যাঁটরা, কিংবা দেয়ালে টাঙানো ফটো, কাচের পাল্লা-ঢাকা দেয়াল আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে-রাখা বইপত্তর, এবং সেইসঙ্গে পুতুলের সহাবস্থান— এতদিনের ব্যবধানেও বিন্দুমাত্র মলিনতার আঁচড় লাগেনি কোথাও। এই ঘরের ভিতর একটা অন্যরকম গন্ধ ছিল; বেশ কিছু সময় ধরে বসে থাকতে থাকতে আজ পুনরায় সে সেই অদ্ভুত আর মোলায়েম গন্ধটুকু পেতে তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। মনে পড়ে গেল, মাকে একদিন এই গন্ধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে মা উত্তর দিয়েছিলেন, "এ-বাড়ি তৈরির পর থেকে এই ঘরে থাকতেন তোর ঠাক্মা। তোর বাবাও তার মাকে একদিন তোর মতো একই প্রশ্ন করেছিলেন। মা কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা অবশ্য তোর বাবা বলেননি আমাকে।" মায়ের কথায় পতিত ধন্দে পড়ে গিয়েছিল, তবে কি জীবদ্দশায় ঠাকুমা এমন-কিছু এই ঘরের কোনো কোনা-ঘুপচিতে লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন, যার কারণে আমৃত্যু এবং এমনকী, তাঁর মৃত্যুরও পরে সেই ঘ্রাণ ব্যাপ্ত হয়ে ছেয়ে আছে? ঠাকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পর মা নিজের ঘর ছেড়ে চলে আসেন এই ঘরে এবং পতিত দেখেছিল সেই থেকে বাবা-মায়ের জীবন দুইখানা ঘরের মতোই, কি সাজসজ্জায় কি ব্যবহারে কি যাপনে, কেমন বদলে গিয়েছিল। মা ক্রমশ অন্তর্মুখী আর বাবা ততই বহির্মুখী হয়ে পড়েছিলেন। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে পতিত কোনো কিছুতে মনঃসংযোগ করতে পারত না। সেসময় গৃহশিক্ষক শ্রী প্রদীপ সামন্তই হয়ে উঠেছিলেন পতিতের নিকট বন্ধু। যদিও পাঠ্যবইয়ের প্রতি পতিতের মনোযোগ কস্মিনকালেও আর ফিরে আসেনি, ফলে স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় অ্যাভারেজ রেজাল্ট নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছে; তবু অন্য নানান বিষয়ে ধীরে ধীরে সে যথেষ্টই চৌকশ হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ ধরে এতসব ভাবনার বলয়ের চারপাশে ঘুরপাক খেতে খেতে পতিত মায়ের বিছানায় কখন যেন শুয়েই পড়েছিল আর, ক্রমশ অনুভূত হচ্ছিল

অত্যন্ত মৃদু আবেশে গন্ধটা পুনরায় ফিরে এসে তাকে অনিবার্য ঘুমের আবেশে নিয়ে চলেছে।

হঠাৎই দরোজার ইলেকট্রিক বেলে ডিংডং শব্দ হলো যেন। তারপর সব চুপচাপ। দু-এক মিনিট পরে আবার একই শব্দের পুনরাবৃত্তিতে ধড়ফড় করে উঠে বসল পতিত। দরজা খুলে দেখল ক্লান্ত বিধ্বস্ত প্রদীপ স্যার দাঁড়িয়ে।

"আপনি?"

"হ্যাঁ আমি। জরুরি দরকার ছিল তোমার সঙ্গে।"

"আসুন, ভিতরে আসুন স্যার।" অবশ্য আবাহনের আগেই তিনি ঢুকে পড়েছিলেন ঘরে এবং সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "এক গ্লাস জল খাওয়াবে পতিত? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

"নিশ্চই স্যার, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।" ভিতর থেকে এক গ্লাস জল এনে স্যারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল সে, "কেমন আছেন? আপনাকে দেখে তো খুব-একটা ভালো ঠেকছে না আমার।"

"আমার ছোটো মেয়ে জবাকে মনে আছে নিশ্চই। কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে ওকে।" কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি কথাটা বললেন প্রদীপ স্যার।

"কবে? ঘটনাটা ঘটল কী করে?" পতিতের গলায় আতঙ্ক ও বিস্ময় মিশ্রিত একটা ভাব প্রকাশ পেল।

"দিন চার-পাঁচ আগে কয়েকজন লোক কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে জোরজবরদস্তি ঘরে ঢুকে জামাই আর ওদের একমাত্র ছেলেকে পিছমোড়া বেঁধে মেয়েটাকে নাকি তুলে নিয়ে গেছে।"

"লোকগুলো চেনা-পরিচিত? ওদের উদ্দেশ্য?"

"চেনা কি না বলতে পারব না, তবে উদ্দেশ্য মোটা অঙ্কের টাকা।"

"আপনার জামাই কি খুব মালদার? মেয়ে কি কারও সঙ্গে বেগড়বাই করেছিল কখনো?"

পতিত প্রতিবারই দুটো করে আলাদা আলাদা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল স্যারের উদ্দেশে আর, তিনিও যথাসাধ্য একটা বাক্যে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম হলো তার:

"তেমন কেউকেটা বড়োলোক নয়, তবে অবস্থাপন্ন। আর, মেয়েকে তো তুমি জানোই— বেপরোয়া স্বভাবের, ঘরে আটকা থাকার নয়। শুনেছি সমিতি-টমিতি গোছের কিছু করত।"

হ্যাঁ জানা আছে বই কী, ডাকসাইটে সুন্দরী জবার সৌন্দর্যকে ছাপিয়েও ওর ডোন্টকেয়ার হাবভাব-ই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ফলে চোখে-মুখে বিদ্রোহী, উগ্র, উদগ্রময় অভিব্যক্তি ফুটে উঠত সবসময়।

"থানায় কোনো রিপোর্ট করেননি আপনার জামাই?" পতিত জানতে চাইল।

"করতে সাহস পাচ্ছে না। লোকগুলো শাঁসিয়ে গেছে থানা-পুলিশ করলে মেয়েকে খুন তো করবেই, সেইসঙ্গে নাতিকেও নাকি তুলে নিয়ে যাবে।"

"এসব কে বলেছে আপনাকে?"

"ছোটো জামাই নিজে এসে বলেছে সব।"

"আপনার বড়ো মেয়ে-জামাইকে জানিয়েছেন?"

"না। কথাটা তোমাকেই জানালাম প্রথম।"

"আ-মা-কে! আমাকেই কেন স্যার?" প্রশ্নটা করে পতিতের খেয়াল হলো অনেকক্ষণ ধরে স্যারকে সে পুলিশ বা উকিলের মতো জেরা করে চলেছে। নিজের এমন আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না সে। তবে কি ঘটনাটাকে তার উটকো বলে মনে হচ্ছে? সে কি এড়িয়ে যেতে চাইছে?

"আমার কেন জানি ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। মনে হচ্ছে, একবার জামাইয়ের মহল্লায় যাওয়া দরকার। কিন্তু একলা যেতে ভরসা পাচ্ছি না।"

পতিত বুঝতে পারে না এরপর মাস্টারমশাইকে কী বলবে সে। তাই চুপ করেই থাকে। মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এতদিন পরে ওঁর চেহারায় যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে সেইসব মেপে নিতে চায় যেন। চুলের পাক ধরা এবং ঈষৎ ফিকে হয়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন আন্দাজ করতে পারে না। চলনে-বলনে সামান্য শ্লথতা এসেছে কি? বয়েসের?

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে? পারবে যেতে?"

"আপনি চাইলে নিশ্চই যাব স্যার।" পতিত সামান্য নীরব থেকে উত্তর করে। যদিও ভেবে পায় না এ-ব্যাপারে কোন্ কাজেই-বা লাগবে সে, তবু, স্যারের আবেদন অগ্রাহ্য করার মতো ঔদ্ধত্যকে প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবতে পারে না।

"তাহলে কাল ভোরবেলা এখান থেকেই নাহয় রওনা হওয়া যাবে। কী বলো?"

পতিতের বোধ হলো, যেভাবে ছাত্রাবস্থায় স্যার টাস্ক আর রুটিনের

বেড়াজালে লেখাপড়ার কাজগুলো করিয়ে নিতেন, অনেকটা সেরকম করে আজও তার এই মধ্যবয়সে ধীরে ধীরে একই কায়দায় নিজের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্মণরেখার ভিতরে এনে ফেলতে পেরেছেন তাকে। অথচ সেই তিনিই নিজের মেয়ে জবাকে ছোটোবেলা থেকে কোনো নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করে তুলতে পারেননি। মানুষের চেষ্টা কোথায় সার্থকতা পেতে পারে আর, কোথায়ই-বা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় মুখ থুবড়ে পড়ে সেটা কখনো শুধুই উপায় কিংবা শুধুমাত্র ইচ্ছেকেই মান্য করে চলে না। সুযোগ এবং প্রয়োজনের তত্ত্বও তাই সবসময় খাটে না, যথাযথ খাঁটিও হয়ে উঠতে পারে না।

"চলুন স্যার, রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলা যাক।" পতিত বলল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো। কাল খুব অন্ধকার থাকতেই রওনা দেয়া ভালো। একেবারে ফার্স্ট ট্রেন ধরেই।"

খাবারদাবার গরম করে টেবিলে সাজিয়ে সবে বসতে যাবে খেতে, আবারও কলিংবেল বেজে উঠল। একবার, দু-বার, তিনবার।

"আমি দেখছি—" বলে, মাস্টারমশাই হাঁটা লাগালেন সদর দরজার দিকে। মিনিট তিনেক পরে পতিতকে চমকে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবক। একগাল কাঁচা দাড়ি, দু-একটায় সামান্য পাক ধরে থাকলেও থাকতে পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না; আলোর বিচ্ছুরণের জন্যই সম্ভবত। ঝাঁকরা চুল এলোমেলো হয়ে কপালে, কানে, গালে ঝুলে রয়েছে। পতিতের মতোই কালো ফ্রেমের চশমা। পোশাক-আশাকের ছিরি-ছাঁদও অনেকটা তারই মতো— সাদা পাজামার উপরে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত বুটিক প্রিন্টের পাঞ্জাবি। হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে যুবকটি হুবহু পতিতের মতো; কেবল বয়েস বছর কুড়ি-পঁচিশ কম। অর্থাৎ কুড়িও হতে পারে, আবার পঁচিশও সম্ভব। আঁটোসাঁটো চেহারা। তার মতো কৃশ তো নয়ই, বরং বেশ সুঠাম ও জোয়ান গোছের। ভঙ্গিটি হাস্যোচ্ছল, উজ্জ্বল আর চোখা-চোখা। উচ্চতায় কি যুবকটি পতিতের থেকে দু-এক ইঞ্চি বড়োই হবে?

পতিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় না দিয়ে ও বসে পড়ল চেয়ারে আর বেহায়ার মতো গোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগল।

"আরে! বড়ো বেয়াড়া লোক তো মশাই আপনি! চেনা নেই জানা নেই, পরিচয়ের বালাই নেই, বাড়িতে ঢুকেই খেতে লেগে গিয়েছেন! বেরিয়ে যান বলছি। এক্ষুনি। এই মুহূর্তেই।" চেঁচিয়ে উঠল পতিত। সেই হুংকারে

বিন্দুমাত্র হেলদোল না দেখিয়ে যুবক ছেলেটি খাবারের থালা থেকে মুখ তুলে সামান্য হাসল, তারপর একটা মুরগির ঠ্যাং হাতে তুলে নিয়ে কামড় বসাল মাংসে। রি-রি করে উঠল পতিতের সর্বাঙ্গ।

"হাসছেন যে বড়ো? কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? পুলিশ ডাকতে হবে?" চেঁচিয়ে বলল পতিত। অসুস্থ শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠল সেই চ্যাচানির রেশ ধরে।

"এত উত্তেজিত হলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন আপনি। এক গ্লাস জল নিয়ে বসুন চেয়ারে। মিছে-মিছেই বিরক্ত হচ্ছেন আমার উপরে। এইমাত্র এক ভদ্রলোক, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, ভিতরে আসতে। পরিচয় দিলেন, আপনার ছেলেবেলার মাস্টারমশাই।" লোকটা মুখের ভিতরে খাবারের টুকরোগুলোকে এদিক-ওদিক চালান করে দিতে দিতে বলে চলল। বলার ভঙ্গিতে বেশ একটা বলিষ্ঠ হাবভাব। "উনি আমাকে আপ্যায়ন করে বললেন, 'এসেছেন? বাঃ! যান খাবার রেডি আছে। এক্ষুনি গিয়ে বসে পড়ুন টেবিলে।' তাই—"

"তাই আপনি কৃতজ্ঞচিত্তে সেই মানুষটারই খাবার খেতে লেগে গেলেন। একবারও ভাবলেন না সেই বয়স্ক মানুষ এত রাতে কী খেয়ে থাকবেন। বাঃ! বলিহারি আপনার সৌজন্যবোধ!" পতিত জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল।

"কেন? উনি যে আমাকে বললেন, দরজা বন্ধ করে দিতে। ওঁর বাড়ির লোকজন সব অপেক্ষা করে আছে। কী এক জরুরি দরকারে তক্ষুনি চলে যেতে হবে।"

"মানে?" আকাশ থেকে পড়ল যেন পতিত। "আপনি ঠিক বলছেন, উনি বাড়ি ফিরে গেছেন?"

"সেরকমই তো জানালেন আমাকে।"

পতিত কেমন হতভম্ব হয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। অন্যমনস্কে মাংসের ঝোলে রুটির টুকরো ডুবিয়ে মুখে পুরে বুঝতে চাইল এখন ঠিক কী করা উচিত হবে তার। উলটোদিকে বসে-থাকা যুবকটি কে? কী ওর পরিচয়? মাস্টারমশাইয়ের পূর্ব-পরিচিত কি? কোনো কি উদ্দেশ্য নিয়ে স্যার এই লোকটাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন? কিন্তু কী উদ্দেশ্য হতে পারে? না কি এই বেহায়া যুবকটি নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মাস্টারমশাইকে বাড়ির

বাইরে বের করে দিয়ে এখন বানিয়ে বানিয়ে গল্প ফাঁদছে? কীসের প্রয়োজনে এত রাতে পতিতের কাছে এসেছে ও? নানা প্রশ্নের তাড়নায় ক্লান্ত হবার ফুরসতও যেন পাচ্ছে না পতিত। অথচ দীপালিদি চলে যাবার পর থেকে কতক্ষণ ধরে সেই সুযোগটুকুর সন্ধানে সে এ-কাজ সে-কাজ এ-ঘর ও-ঘর কত চেষ্টাই-না করেছে। শেষে মা-ঠাক্‌মার ঘরে গিয়ে একটু সোয়াস্তি পেতে-না-পেতেই যত উলটোপালটা কাণ্ড ঘটে চলেছে।

"দেখুন পতিতদা, এখন কিছুকাল আমি আপনার এখানেই থাকব। যদিও নামটা বড্ড সেকেলে আর বিতিকিচ্ছিরি, তবু জানিয়ে রাখি, আমারও নাম পতিতপাবন। আপনার মতোই পরিচিতরা আমাকে পতিত বলে সম্বোধন করে। কিন্তু এক নামে একই বাড়িতে দু-জনের পক্ষে আলাদা হয়ে থাকাটা বেশ ঝক্কির। আমি যেহেতু আপনার থেকে বয়েসে বেশ ছোটো, আমাকে তাই পাবন বলে ডাকবেন।"

অসহ্য! একই নামের গপ্প ফেঁদে যুবকটি আসলে কী চায়? আমাকেই বাতিল করে দিতে? কথাটা মনের ভিতর তোলপাড় করলেও পতিত নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল: "কিন্তু আমি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই?"

"এখানে থাকার ব্যাপারে তো? হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারেন। যেহেতু এই বাড়ি আপনার। অবশ্য মালিকানাটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, আপনার নিজের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, এমনকী রক্ষণাবেক্ষণও চলে পূর্বপুরুষের পয়সায়। কিন্তু সেসব কথা বরং থাক। আপাতত আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে নাহয় পরামর্শ করা যাবে। এত রাতে রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরব বলুন? অজ্ঞাতকুলশীল হলেও আপনার ও আমার মধ্যে চেহারার মিলকে যদি আত্মীয়তা বলে ধরে নেন তবে বালাই থাকে না কোনো। তবু সন্দেহ বা ভয় থাকে যদি, সদরে-খিড়কিতে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।"

যুবকটি সব জানে নাকি পতিতের বিষয়ে? এমন গড়গড় করে বলে গেল বাড়ির বৃত্তান্ত! পতিত প্রথমে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও ওর অর্বাচীনতায় বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠল। বলল: "কিন্তু চিনি না জানি না আপনার মতো একজন অপরিচিত লোককে আজকের রাতটুকুই-বা কী আক্কেলে আমি থাকতে দেব শুনি?"

"এটা তর্কাতর্কির বিষয় নয় পতিতদা। এত রাতে যখন আপনার বাড়িতে

ঢুকেই পড়েছি তখন আজকের রাতটুকু কাটিয়ে কাল বরং দুইজনে মিলে ভাবতে বসব এরপরে কী করা যাবে। এখন চলুন, শোবার ঘরটা দেখিয়ে দেবেন চলুন। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, মাইরি।"

ছেলেটার বাচনভঙ্গি এতটাই একগুঁয়ে আর জবরদখলি যে, পতিতের বুঝতে অসুবিধা হলো না, সে চাইলেও এই দ্বিতীয় পতিতপাবনকে কোনোমতেই এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না। এত রাতে চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে গেলে ব্যাপারটা বরং হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে। পুলিশ ডেকে কোনো সুরাহা হবে তেমন ভরসা কি সত্যি সত্যি আছে? থানা-পুলিশ হয়ে ব্যাপারটা শেষমেশ এমনই জটিল হয়ে দাঁড়াবে যে, তখন তাকেই জড়িয়ে পড়তে হবে বিস্তর ঝামেলায়। কে-না জানে, পুলিশে আস্থা দেখানোর থেকে বরং ক্লাবের ছেলেদের উপর ভরসা করাটাই বেশি বুদ্ধিমানের। কাল ক্লাবের ছেলেগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু করা যাবে। ভাবল সে।

অগত্যা পতিত তার নিজের ঘরেই ওর শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে একবার ভাবল মা-ঠাকুমার ঘরে শুয়েই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেবে, কিন্তু কোন্-এক কারণে বহু বহু দিন বাদে, খুব-সম্ভব বাবার মৃত্যুর পর আজ আবার বাবা-মায়ের ঘরে ঢুকে শৈশবের স্মৃতিজড়িত পালঙ্কে নিজের ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরকে ছেড়ে দিয়ে রাত্রির শিথিল বিবশ আরামটুকুকে পেতে চাইল সে ঘুমের ভিতরে। অসুস্থ শরীর আর ধকল সইতে পারছিল না। বিশ্রাম দরকার।

অঙ্কটাকে অনেকক্ষণ ধরে কষার চেষ্টা করছিল পতিত। কিন্তু কোনোমতেই মেলাতে পারছিল না। শেষমেশ, হয়তো-বা কোনো জুতসই গোঁজামিলের ধাক্কায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল উত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু ঠিক তখনই প্রদীপ স্যার খাতাটা তার কাছ থেকে টেনে নিলেন। মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্ক-কষার প্রত্যেকটি ধাপকে যাচাই করে নিতে চাইলেন তিনি, সম্ভবত পতিতের সমাধানের ধরনে মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয়েছিল; হয়তো মনে হয়েছিল, পতিত অঙ্কটার জন্য ব্যবহৃত সূত্রগুলিকে খামোকা জটিল কয়েকটা পদ্ধতিতে ভেঙে ভেঙে চলছিল, যার ফলে বড়ো দীর্ঘ হয়ে উঠছিল সমাধান। অথচ আশ্চর্য, কোনো ভুল বা, ছাত্ররা উত্তর মিলিয়ে দেবার উপায় হিসেবে যে-পন্থা সচরাচর নিয়ে থাকে, অর্থাৎ গোঁজামিল, তেমন সস্তা চাতুরিও খুঁজে পেলেন না কোত্থাও। মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন স্যার। আপাতভাবে কোনো ভুল চোখে না পড়লেও এতদিনের পরিচিত অভিজ্ঞতার দরুন পুরো পদ্ধতিটাকেও কোনোক্রমে মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি, কারণ প্রচলিত সব ধ্যানধারণার থেকে পতিতের অঙ্ক-কষার পদ্ধতি ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। অতএব, মাস্টারমশাই বার বার খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে চললেন, এবং বোলাতেই থাকলেন। প্রতিবারই বুঝতে পারলেন বেশি বেশি করে ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছেন। অগত্যা পতিতকে বললেন, "আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল আবার—"

"কাল আবার কী স্যার?"

"কিছু না। আমি এই খাতাটা নিয়ে যাব আজ।" বলে, চলে গেলেন তিনি। কোনো টাস্ক না দিয়ে।

স্যার বিদায় নেবার পর বহুক্ষণ থম মেরে বসে রইল পতিত। অঙ্কটা তার মাথার ভিতর কেমন যেন চলে-ফিরে বেড়াতে লাগল, আর ক্রমশ দৃষ্টি শ্রবণ ঘ্রাণ স্পর্শ স্বাদ—পঞ্চেন্দ্রিয় রহিত চৈতন্যশূন্যতায় ডুবে রইল সে। উত্তরের সংখ্যাটিকে কেমন অদ্ভুতুড়ে এক আজব সংখ্যা বলে বোধ হতে লাগল।

পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার পর ফের অঙ্কটা ফিরে এল তার চিন্তার

ভেতর। সমাধানের প্রত্যেক ধাপ মনে পড়ার সঙ্গো সঙ্গো কী খেয়ালে পতিত তার প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে বেরিয়ে আসছিল ঘরের থেকে। এমন সময় বাবাকে ঠাকুমার ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে ডাইনিং হলের জানলার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সব কিছু গুলিয়ে গেল তার।

"বাবা—" চাপা ও ভাঙা-ভাঙা স্বরে ডেকে উঠল পতিত। সদ্য ঘুম থেকে ওঠার কারণেই সম্ভবত গলার থেকে কোনো কিছু ফেঁসে যাওয়ার মতো অমন অদ্ভুত ডাক বেরিয়ে এসেছিল।

"হ্যাঁ," বলে পতিতের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি, "তোর ঠাকুমা আজ এইমাত্রই চলে গেলেন।" কথাগুলো বাবার মুখের থেকে থেমে থেমে স্বগতোক্তির মতো ফিসফিসিয়ে উচ্চারিত হলো।

"চলে গেলেন?"

"হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এইখানে, এই সময়ের ভিতর আরও কিছুদিনের জন্য ফেলে রেখে মহাপ্রস্থানের পথে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন তিনি।"

"সেখানে পাণ্ডবেরাও কি তবে প্রতীক্ষা করে আছেন আজও? সেই কুকুরটাও?" কথাটা বলার সময় পতিতের মনে পড়ে গিয়েছিল ঠাকুমা কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা মহাভারত থেকে পাঠ করে করে শোনাতেন কাহিনি। তিনি এমনভাবে বর্ণনা দিতেন যে, সমস্ত ঘটনা যেন জলজ্যান্ত প্রত্যক্ষ করত পতিত। 'মহাপ্রস্থান' শব্দটা তাঁর কাছেই প্রথম শোনা।

"হ্যাঁ আছেন বই কী। নিশ্চই অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সেখানে সকলেই অপেক্ষায় দিন কাটায়। এখানকার মতো এত উদ্‌ব্যস্ত নয় তারা কেউ।" বাবা জোর দিয়ে দিয়ে বললেন।

"কিন্তু বাবা, ঠাকুমাকে যে আমার বলা হলো না কাল থেকে একটা অঙ্ক কিছুতেই, কোনো নিয়মেই মেলাতে পারছি না আমি। এমনকী, মাস্টারমশাই পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেননি সেটার সমাধান কীভাবে হবে।"

"ঠাক্‌মা তো কখনো কোনো ইস্কুলে যাননি পতিত। তিনি অঙ্ক মেলাবেন কী করে?"

"ঠাক্‌মা মেলাবেন কেন! তার কাছে বসে নানান গল্পে-কথায় কখন যেন আমার মাথার ভিতর ঢুকে পড়তে থাকে অঙ্কের একের পর এক ধাপ। তখন খাতা নিয়ে বসলেই চরচর করে নির্ভুল কষা হয়ে যায় অঙ্ক। সে

যত কঠিনই হোক।"

"তা-ই? আশ্চর্য! সত্যি কি আছে অদৃশ্য সুতো কোনো— শূন্য থেকে ঝুলে, জাদু দড়ির মতো? বেয়ে বেয়ে অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় মালার মতো গেঁথে-থাকা অঙ্কের যত ম্যাজিক ফিগার?" কথা ক-টা শেষ করে জানলার গ্রিলে ফের হাত-মাথা রেখে বাবা আনমনা হয়ে গেলেন।

কথাগুলোর কোনো অর্থ খুঁজে পেল না পতিত। আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঢুকেই মাকে দেখতে পেল— ঠাকুমার পায়ের কাছে মেঝেতে নিথর বসে। তার দু-চোখ বেয়ে বয়ে-চলা অশ্রুতে মা যেন ছোট্ট একরত্তি মেয়ে বনে গেছে। তখন ঠাকুমার নিথর দেহের দিকে চেয়ে পতিত স্পষ্ট দেখতে পেল অসংখ্য সাদা রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়, কয়েকটা তো মায়ের শাড়ির উপরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসছে, কিছু পরে উড়েও যাচ্ছে। উড়ে উড়ে ঘুরপাক খেয়ে আবারও এসে বসছে। তবে সবগুলোই প্রজাপতি কি না বলা মুশকিল। সবারই গায়ের রং যে সাদা! আকারেও এক! পুবদিকের খোলা জানালার বাইরে হাওয়া দিচ্ছিল এমন যে, আশ্বিনের নীল আকাশকে ঢেকে দিয়ে অসংখ্য সাদা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছিল। পতিত তখন ঠাকুমার মুখের দিকে চাইল। দেখল সে-মুখ নীল। ঠিক যে-নীল দিয়ে মানচিত্রের পাতায় নদী বা সাগর বোঝানো হয়। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পতিত ফের ঢুকে পড়ল তার পড়ার ঘরে, মানচিত্রের বই খুলে বসে গেল পড়ার টেবিলে। তার ভাবনার থেকে অঙ্কটা পুরোপুরি উবে গিয়েছিল।

"পতিত— অ্যাই পতা— কখন থিক্কা ডাকত্যাছি তবু সাড়া দিস না ক্যান? ঘুমাইস নাকি?" পতিত দেখল ভরদুপুরে জানালার বাইরে পলাশ দাঁড়িয়ে।

"কেন রে, কী ব্যাপার?"

"প্রদীপ স্যারের ছোটো মাইয়াডারে খুইজা পাইছে পুলিশ। সঙ্গে কইরা নিয়া আইছে বাড়িতে। চল, দেখবি চল, পাড়ার সক্কলে কেমন হামলায়া পড়ছে।"

"কোথায় গেছিল রে মেয়েটা? তুই জানিস কিছু?"

"যাইব কীরে! ভুইল্লা গেলি? কারা য্যান অরে বিজয়াদশমীর দিনে তুইল্লা নে গেসল না!" টানা বলে যেতে থাকে পলাশ। কথার বাঁধ যেন ভেঙে পড়ে। "তবে তুই যাই ক' পতা, মাইয়াটারে দেখতে কিন্তু হেভ্‌ভি, এক্কেরে য্যান পরি। সুচিত্রা স্যানরেও হার মানায়। আমার তো মাঝে মাঝেই মনে হয় অরে আইন্না বাইন্ধা রাখি ঘরের মধ্যখানে। সারাটা দিন চক্ষু ভইরা দেখি, আর দেখি। ও গুম হইবার পর থিক্কা আমার হালায় কিছু ভাল্লাগ্‌তো না। মনে হইতো, লোকগুলানরে পাইলে দেইখ্‌খা নিতাম।"

"কী করতি?" পতিত হেসে ওঠে।

"খুন ছুটায়ে দিতাম। পোন্দের ভিতর গরম শিক ঢুকায়ে ছাড়তাম। শাল্‌-লা!" আক্রোশ প্রকাশ করতে গিয়ে 'হালা'র বদলে ওর মুখে 'শাল্‌-লা'র ব্যবহার এই প্রথম শুনল পতিত।

"তাই?" এবার হাসি চেপে বলল সে।

"অ্যাই পতে— চল্‌ না রে ভাই, একবার পরিরে গিয়া দেইখ্‌খা আসি। পুলিশ কাউরে ও-বাড়ির ভেতর ঢুকবারই দেয় না। তর তো স্যার, তর লগে গেলে বাধা দিব না কেউ।"

"ও, তুই তবে সেই ধান্ধায় এসেছিস আমার কাছে? না না, একলাই যা তুই। এমন অসময়ে আমি গেলে স্যার রাগ করবেন খুব।"

"আইচ্ছা। আমার লগে অ্যামন করতাছস, কর। কিন্তু তুই তো আমার ন্যাংটা বয়সের বন্ধু, বন্ধু চাইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু করবার লাগে। একদিন আমারেও তোর দরকার হইতে পারে। হেইডা ভুলোস না।"

পলাশ জানলার পাশ থেকে সরে বেরিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো পতিতের, তাই তো, পলিদিও হয়তো গিয়েছে সেখানে? "অ্যাই পলাশ," ডেকে ওঠে সে, "পলিদিকে দেখেছিস ওখানে?"

"দেখিছি কীরে?" আবার জানলায় উঁকি দিয়ে দাঁড়ায় পলাশ। "পলিদিরে সঙ্গে কইরাই তো পুলিশ জবারে লইয়া আইছে। হেই নাকি পুলিশরে সব ইনফরমেশন দেছে।"

"আমার তো সব তালগোল পাকিয়ে গেল রে! পলিদি চিনত কিডন্যাপারদের?"

"হেইডা আমি ক্যাম্‌নে কমু। তুই নিজেই গিয়া পলিদিরে জিগা না!"

"আচ্ছা, চল, রহস্যটা জেনেই আসি।" পতিত একটা শার্ট শরীরে গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির সামনে তখন এক হুলুস্থূল ব্যাপার। লোকে লোকারণ্য, ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি, চেঁচামেচি, কথা-কাটাকাটি— সবমিলে ভয়ানক কাণ্ড। পুলিশের দল লাঠি উঁচিয়ে বাড়ির সামনে ব্যারিকেড করে রেখেছে। তবু, ধাক্কা দিয়ে গুঁতো মেরে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে পলাশই তাকে ঠেলে নিয়ে ফেলল এক পুলিশকর্মীর সামনে। কিন্তু পতিত ভেবে পেল না কীই-বা বলবে লোকটাকে। কী বলে অনুমতি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে বাড়িটার দিকে। হঠাৎ ভিড়ের এক মোক্ষম ধাক্কায় কোনোক্রমে পুলিশের শরীর বাঁচিয়ে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল সে সামনে, ঠিক রাস্তার উপর। নাক ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। পুলিশটিও 'ধর ধর' বলে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল আর, মুহূর্তের মধ্যে সেই লাঠি প্রবল বেগে নেমে এল তার দিকে; কিন্তু পতিত টের পেল সেটা পিঠের উপর পড়ার আগেই তার শরীরকে আড়াল করে পলাশ এক নিমেষে নিজের শরীর ছুড়ে দিয়ে সেই মোক্ষম আঘাত হজম করে নিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় মানুষজন সামান্য সময়ের জন্য হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হইহই করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যারিকেডের উপর। জনতা-পুলিশে বেঁধে গেল খণ্ডযুদ্ধ। এই সুযোগে পলাশ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পতিতকে কাঁধে তুলে ছুট লাগাল মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দিকে।

মাস্টারমশাইয়ের ছোটো মেয়ে জয়ার অন্তর্ধান-প্রসঙ্গ পরে সে টুকরো

টুকরো করে শুনেছিল পলাশ, পলিদি আর মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে। কেননা আঘাত অথবা ভয়— যেকোনো একটির কারণে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সেদিন; কারও কথাই শোনার মতো শারীরিক অবস্থা ছিল না। কয়েক দিন যেতে, সুস্থ হয়ে উঠে আলাদা আলাদা করে ঘটনার যে-বর্ণনা শুনেছিল তিন জনের থেকে তাতে অবাক হয়েছিল খুব। তিন জনের থেকে তিন ভিন্ন বিবরণী পেয়েছিল সে। ফলে রীতিমতো হতাশই হয়েছিল: আসল ঘটনা যে কী, কোন্‌টিকে সত্য আর কোন্‌টিকেই-বা মিথ্যা বলে ধরে নেবে, বুঝে উঠতে পারেনি। তিন জনের কথার থেকে যে নিজের মতো করে বানিয়ে তুলবে সত্য, সেটা তো আত্মপ্রবঞ্চনাই।

প্রথমেই ধরা যাক পলাশের কথা। সেদিনের ঘটনার চার-পাঁচ দিন পরে, কলেজ থেকে দুপুর দুপুর বাড়ি ফিরছিল পতিত। বড়ো রাস্তার মোড়ে পলাশের ডাকে থমকে দাঁড়িয়েছিল পতিত।

"কীরে! এই ভরদুপুরে এখানে কী করছিস?"

"কিছু না। তর লগে একখান কথা আছিলো।"

"কী কথা।"

"অ্যাখানে না। বিলের ধারে চ।"

পলাশের মুখের দিকে চেয়ে পতিত আপত্তি জানাতে পারেনি। ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল বিলের ধারের শানবাঁধানো ঘাটের কাছে। সেখানে অশ্বত্থ গাছের ছায়া ভরদুপুরের গরমকেও শীতল আবেশে জড়িয়ে বেশ একটা স্বস্তি এনে দিচ্ছিল।

"পাড়ার লোকে যাই কউক, আসল ঘটনা হইল মাস্টারমশাইয়ের মাইয়াডারে, মানে জবারে যে-লোকগুলান ধইরা লয়া গেসল, তাগোর একডারে পলিদি চিনত। ধরা পইড়া হালারা স্বীকার পাইছে, তাগোর একজন নাকি জবার প্রেমে পাগল। কিডন্যাপার-গুলান সেই একজনার লগে জোর কইরা বিয়া দিব বইল্লাই জবারে ধইরা নে যায়। কিন্তু জবার তো বিয়ার বয়েস না, নাবালিকা, তাইর উপরে পলিদি একজনরে চিইন্না ফ্যালায় তাগোর প্ল্যানখান ভ্যাস্তায় যায়। শ্যাষম্যাশ বিপদ বুইঝা সব হালায় পুলিশের কাছে সারেন্ডার করছে।"

"জবাও হয়তো ভালোবাসত ছেলেটাকে।"

"এক্কেরে না। জবা নিজের মুখে সেদিন কইছে, সে কাউরে চিনতই না।

পলিদিও তো একই কথা কইল। তর লগে তো দেখা হইব, জিগায়ে দেখিস তারে।"

"হুঁ।" পতিত গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, "জবাকে যে তোর ভালো লাগে সে-কথা বলেছিস কখনো ওকে?"

"না। ওর মুখামুখি হইলেই আমার ক্যামোন জানি হয়। আমার কী আছে ক, মনে তাই সর্বসময় ভয়-ভয় লাগে— ও কি কখনো ভালোবাসব আমায়? মুদির দোকানে এটা-ওটা ছোটোখাটো অডার সাপ্লাই করি। তোগোর মতো ল্যাখাপড়াও শিখি নাই যে, ভালো পাশ দিয়া ভবিষ্যতে কোনো চাকরি-বাকরি জুটায় নেব। তুই একবার অরে আমার হইয়া ঠারেঠোরে জিগায় দেখ না ভাই, অর ভাবগতিকখানা কী।"

"না। তা হয় না। এটা তোর একেবারে পার্সোনাল ব্যাপার। তাছাড়া জবা আমার স্যারের মেয়ে। কলেজে ঢোকার আগে এই সেদিনও তিনি নিয়মিত আমাকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাবা কিছু জানতে পারলে আমাকে বাড়ি থেকে বেরই করে দেবেন।"

"সরি। তরে অনুরোধ করাডা বোধহয় ঠিক অয় নাই। তবে এইডাও ঠিক পতা, বাইচ্চা থাইকতে জবার অইন্য কারোর লগে বিয়া হইব এইডা আমি কক্ষনো মাইনবার পারুম না। আইচ্ছা, চলি রে পতা!"

পলাশের সঙ্গে সেটাই ছিল পতিতের শেষ সাক্ষাৎ। মাস্টারমশাইরা অল্প ক-দিনের ভিতর এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাবার দিন সাতেক আগে গলায় দড়ি দেয় পলাশ। পতিত যদিও সে-লাশ দেখতে যায়নি, কিন্তু কত রাত যে সেই ঝুলন্ত দেহটাকে দেখে ঘুম ভেঙে যেত তার! মনে হতো কত কথা বুঝি বলার ছিল পলাশের। অসমাপ্ত সেসব কথারা গুমরে গুমরে উঠতে চাইত। ঘেমে-নেয়ে যেত সে ঘুমের ভিতরে।

পলাশের মৃত্যুর আগের দিনই পলিদির কাছে গিয়েছিল পতিত। সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিল, "জবাকে যারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তুমি চিনলে কী করে পলিদি?"

"কে বলেছে চিনতাম আমি? মাস্টারমশাই? জবা?"

"না। পলাশ বলছিল।"

"ও ভুল জানে। জবাকে ছেলেগুলো মোটেই জোর করে তুলে নিয়ে

যায়নি। জবা নিজে থেকেই গিয়েছিল।"

"মানে? ঠিক বলছ তুমি?"

"তোকে বলেই বলছি। কিন্তু লক্ষ্মীটি, কাউকে বলিস না এ-কথা। মাস্টারমশাইকে আমি কথা দিয়েছি সেই ঘটনার কথা কোনোদিন কাউকে বলব না।"

"আমাকে বললে যদি তোমার কথার খেলাপ হয়, তবে শুনতে চাই না এর বেশি।" বলেছিল পতিত।

"মোদ্দা কথাটা যখন বলেই ফেলেছি তখন বাকিটা শুনতে আর আপত্তি করছিস কেন? তাছাড়া তোর ভুল ভাঙানোটাও জরুরি আমার দিক থেকে। তুই আমাকে মিথ্যে জানবি সেটা কোনোমতেই সহ্য হবে না আমার।" পলিদি বেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিল।

"বেশ, বলো তবে। শুনছি।"

"বিজয়া দশমীর সেদিন সবে সন্ধ্যে হয়-হয় তখন। বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বাবা ফিরছেন না দেখে আমি প্রথমে তোর খোঁজে প্রতিমা ভাসানের পুকুরঘাটটায় যাই। একা জনহীন বিলের ধারে যেতে ভয় করছিল আমার। কিন্তু পুকুরঘাটে তোর দেখা না পেয়ে তোদের বাড়িতেও যাই। তবুও খোঁজ পেলাম না তোর। মাসিমাও বলতে পারলেন না কিছু। তখন কোনো উপায় না দেখে একা-একাই চলে যাই বিলের ধারে।"

"হ্যাঁ, বিবুর সঙ্গে সেদিন গঙ্গায় ভাসান দেখতে গিয়েছিলাম আমি।"

"বাবার জন্য দুশ্চিন্তা যেমন ছিল, তেমন ভয়-ভয়ও করছিল শুনশান জায়গাটা দিয়ে যেতে। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে গাছের আড়ালে আড়ালে হাঁটছিলাম পশ্চিমের ঘাট লক্ষ্য করে। দূর থেকে দেখি, চার-চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। অত দূর থেকেও ওদের একজনকে আমার খুবই চেনা লাগছিল। কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না কোথায় দেখেছি। ছেলেগুলোর হাবভাব তেমন সুবিধার লাগছিল না। মনে মনে ভাবলাম, বাবার খোঁজে আর কাজ নেই, সরে পড়াই ভালো। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, আঁচলে যতদূর সম্ভব মুখ আড়াল করে হনহনিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে জবা। তৎক্ষণাৎ আমার ওই ছেলেটার মুখ মনে পড়ে গেল। জবার সঙ্গেই ওকে আমি এক-আধবার দেখেছি মোড়লপাড়ার দিকে। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ করলাম, জবাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটা এগিয়ে এল, আর

তারপর, ওরা দু-জন বিলের পাড় ধরে হাইওয়ের দিকে চলতে শুরু করে দিল। বাকি লোকগুলোও খানিক পরে সেদিকে রওনা দিল। আমার কী যেন দারুণ আতঙ্ক হলো। এক মুহূর্তও আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি বাড়ি।"

"এতসব তুমি আমাকে বলোনি কেন আগে?"

"তোর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো বলতাম। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তোর কী যে হয়! এ-বাড়ির পথই মাড়াস না।"

পতিত সামান্য চুপ থেকে বলল, "ছেলেগুলোকে ধরিয়ে দিয়ে কিন্তু ঠিক করোনি তুমি। জবা তো স্বেচ্ছায় গিয়েছিল! ওদের দোষ কী? তাছাড়া খালাস পেয়ে যদি তোমাকেই প্রতিশোধের টার্গেট করে বসে ওরা?"

"জবা তো নাবালিকা। তার উপর ওরকম ধুমসো একটা ছেলে! ছেলে না বলে লোকই বলা ভালো, কেননা শুনেছি সে বিবাহিতও; জবাকে ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে ওর জীবনটাকেই তো নয়-ছয় করে দিত। সব জেনেও চুপ করে থাকতাম?"

শুনে, থম মেরে যায় পতিত। কোনো কথা খুঁজে পায় না। ফিরে আসে বাড়ি।

পরদিন পলাশের মৃত্যুর খবর জানার পর বারবার মনে খচ খচ করছিল, গতকাল পতিতের সঙ্গে এইসব কথা হবার পর পলিদি কি পলাশের সঙ্গে দেখা করেছিল? এই নিয়ে পলাশকে কি বলেছিল কিছু?

পরে তা জিজ্ঞাসা করতেই পারত পলিদিকে। কিন্তু না। কোনোদিন আর এই প্রসঙ্গ তোলেনি কারও কাছে। পলিদির কাছে তো নয়ই।

পলাশের মৃত্যুর দিন দুই-তিন পরে মাস্টারমশাই এসেছিলেন বাড়িতে। বাবার সঙ্গে বৈঠকখানার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল তাঁর। পতিত কোনো-একটা কাজে ঢুকতে গিয়ে সে-ঘরে, ওঁদের কথোপকথন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার পাশে। ভিতরে প্রবেশ করা আর হয়ে ওঠেনি। তবে, আড়াল থেকে শুনে নিয়েছিল সেই কথাবার্তা। মনে মনে অপরাধবোধ হলেও নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি কৌতূহলের থেকে।

স্যার: মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবেই কি শেষমেশ এত কষ্টের তৈরি বাড়িটা বেচে দিয়ে এ-পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে দাদা?

বাবা: ওছাড়া আর কীই-বা করতে পারেন আপনি? বরং তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোনো ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিন।

স্যার: ভয় হয়। বিয়ের পরে পাত্রের বাড়িতে যদি জানাজানি হয়ে যায়! ওদের কি এ-কথা বিশ্বাস করানো সম্ভব হবে যে, ওরকম সোমত্ত মেয়েকে দু-দিন ধরে ছেলেগুলো ক-টা টাকার লোভে স্রেফ আটকেই রেখে দিয়েছিল? অন্য মানে কি করবে না ভেবেছেন?

বাবা: আপনি কাছাকাছি বিয়ে না দিয়ে কোনো দূর পাড়াগাঁর জ্ঞাতিঘর দেখে বিয়ে দিন। সেইসঙ্গে আপনারাও এ-তল্লাট ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যান, যেখানে আপনাদের খোঁজ পাওয়া কঠিন। যত ঘনিষ্ঠই হোক, কাউকেই ঠিকানা দেবেন না। এমনকী আমাকেও না।

স্যার: স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেব বলছেন?

বাবা: সে-ছাড়া অন্য উপায় আছে কি কোনো? তাছাড়া চাকরির মেয়াদও তো প্রায় ফুরিয়েই এল। এদিকে নানা লোকে যে নানা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে কি সম্মান থাকছে আপনার? একজন শিক্ষকের সম্মান গেলে ছাত্ররা কি তাঁর পড়ানো গ্রহণ করে? শুনেছি, পলাশ ছোঁড়াটাও জবাকে নিয়ে নাকি সুইসাইড নোট-টোট কীসব লিখে রেখে গেছে—

স্যার: হ্যাঁ শুনেছি।

বাবা: ভাগ্য ভালো, পলি বুদ্ধি করে সেই নোট সরিয়ে ফেলায় পুলিশের হাতে গিয়ে পড়েনি। পাড়ার লোকেদের মধ্যেও জানাজানি কিছু হয়নি, আমরা কয়জনই জানি শুধু। কিন্তু ভবিষ্যতে হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কী?

স্যার: চারদিককার নানা কানাঘুসোয় বুঝে উঠতে পারি না মেয়ের আমার কী দোষ। সৌন্দর্য তো ঐশ্বরিক ব্যাপার। সেটা যদি কিডন্যাপিংয়ের কারণ হয় তাতেও কি দোষ ওর? পলির জন্যই বড়ো কোনো দুর্ঘটনার আগে এত সহজে আবার ফিরে পেলাম মেয়েটাকে। নইলে লোকগুলো যা মুক্তিপণ ডিমান্ড করেছিল, জমি-বাড়ি মায় বউয়ের গয়না বেচেও সে-টাকার জোগাড় হতো না।

বাবা: দেখুন মাস্টারমশাই, অবান্তর ভেবে কোনো লাভ নেই। যা করলে সবদিকেই রক্ষা, তাই করুন। সেইটেই কর্তব্য।

স্যার: কিন্তু মেয়েটা যে সবে ষোলো পেরিয়েছে। এখনই ওর বিয়ে দিয়ে

দিলে আইনত অন্যায় হয় না কি?

বাবা: সেইজন্যই তো পাড়াগাঁর পাত্রের কথা বললাম আপনাকে। আইন যতই থাক-না-কেন, এদেশের পাড়াগাঁয়, ওইটেকেই মেয়েদের বিয়ের সেরা বয়েস বলে মনে করা হয়। গোষ্ঠীসমাজের বিশ্বাসকে নাকচ করা অত সহজ নয়। তাছাড়া বিপদ-আপদের সময় অত বাছবিচার করলেই-বা চলবে কেন?

স্যার: ঠিক, ঠিকই বলেছেন আপনি; এছাড়া করার কিছু নেই।

এরপর নীরবতা নেমে আসে ঘরে। তখন দ্রুত পতিত সরে যায় দরজার পাশ থেকে। নিজের ঘরে চলে আসে। চুপটি বসে থাকতে থাকতে মনে হয় তার, স্যার সব কথা সত্যি বলেননি বাবাকে। কিছু যেন গোপন করে গেছেন সারাক্ষণ। হঠাৎ কাউকে কিছু না-জানিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে বিলের ধারে। সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঁধানো ঘাটের ধারে। জলের স্রোতের ভিতর আকাশের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একসময় মনে হয় তার, আর কোনোদিন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই সম্ভবত ঠিক। মনে হয়, জবার অন্তর্ধানপর্ব নীরবে কখন যেন স্যারের সঙ্গে তার একটা দূরত্ব গড়ে তুলেছে। ছোটোবেলার সমাধা-না-হওয়া অঙ্কটার মতোই কেন যে এই দূরত্ব, সে-ধাঁধার কিনারা হওয়া কখনো সম্ভব নয়। কখনো কখনো বিভ্রম সত্যের থেকেও কঠিন ও বাস্তব হয়ে ওঠে।

ঘুম ভেঙে নিজেকে বাবার বিছানায় আবিষ্কার করল পতিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দ্বিতীয় পতিতপাবনের কথা। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে তড়িঘড়ি হাঁটা দিল নিজের ঘরের দিকে। দেখল, কেউ নেই সেখানে। তবে কি বাথরুমে গিয়েছে? নাঃ, বাথরুমের দরজা তো খোলা। তবে? সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখল সেটা আলগা করে ভেজানো। তাহলে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়েছে? "উফ বাঁচা গেল!" বিড়বিড়িয়ে নিজেকেই শোনাল সে। তারপর দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে। বিছানা, চেয়ার-টেবিল, বইয়ের তাক, ধীরে ধীরে পুরো ঘরখানারই চারপাশ ঠাহর করতে করতে বুঝে নিতে চাইল, পাবন (পতিত বা পতিতপাবন বলার চেয়ে ছেলেটার কথামতো ওকে পাবন বলে উল্লেখ করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো এই মুহূর্তে।) এখানে কাল সারারাত ধরে কী করেছিল— ঘুমিয়েই ছিল, না কি পতিতের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াঘাঁটা করেছিল? সে সত্যিই ভারি অবাক হয়ে গেল যখন কোনোভাবেই ঘরের ভিতরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন খুঁজে পেল না। সব কিছুই রয়ে গেছে আগের মতো। যেন কাল রাতে কেউ ছিলই না এখানে। স্বভাবতই তীব্র অনুসন্ধিৎসায় বিছানা-বালিশ-টেবিল-চেয়ার-আলমারি-বইপত্তর-ফটোক্যালেন্ডার— সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করতে লাগল সে। টেবিলের ড্রয়ার টানতেই ড্রয়ারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা ডায়রি, আর, তার ভিতরে গুঁজে-রাখা ফাউন্টেন পেন একটা। দামি পার্কার। এই পেন পতিতের ঠাকুরদার। বাবা তাঁর জীবিতকালে এটাকে পারতপক্ষে কাছছাড়া করতেন না। তবু লুকিয়ে-চুরিয়ে পতিত তার কিশোর বয়সে, যৌবনকালের শুরু-শুরুতে পেনটা দিয়ে এই ডায়রিতে নানা কিছু লিখত, আঁকিবুকি কাটত। বাবার মৃত্যুর ঠিক পরে পরে কীভাবে যে খোয়া যায় দুটোই, রহস্যই থেকে গেছিল তার কাছে। অনেক দিন পরে আজ এই মুহূর্তে দুটোকে ফিরে পেয়ে কেমন যেন হতভম্ব আর নার্ভাস মনে হলো নিজেকে। সেইসঙ্গে অদ্ভুত অস্বস্তিও। কিন্তু তার জন্য আরও যে-চমক অপেক্ষা করে ছিল, তাকে কীভাবে আত্মস্থ বা ব্যাখ্যা করবে ভেবেই পেল না। নিদারুণ রকমের বিপন্ন ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট,

আধ ঘণ্টা কি তার বেশি বা কিছু কমও হতে পারে, স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল চেয়ারে। যেন সমাধিপ্রাপ্ত; সম্পূর্ণ নিথর হয়ে থুতনিকে নামিয়ে বুকের উপরে। ডায়রিটা ছিল কোলের ওপর খোলা অবস্থায়। দৃশ্যটা খা খা করা।

আচমকা ডোরবেলের শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। উঠে গেল দরজার কাছে। দীপালিদি।

"সেই কখন থিকা ব্যাল বাজাই আর বাজাই, কোনো সাড়াই পাই না। ঘুমায়ে ছিলা নাকি?"

পতিত কোনো উত্তর দেয় না। দীপালিদি ভিতরে চলে গেলে সে চেঁচিয়ে "দীপালিদি, আমি একটু ঘুরে আসছি" বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কখন-যে বিলের ধারের ঘাটে এসে বসে খেয়াল হয় না। ইদানীং বিলের অনেকটাই ভরাট হয়ে গেছে আবর্জনায়। চারপাশে পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশও নেই তেমন আর। কেবল ভেঙেচুরে চুন-শুরকি-ইটের হা বেরিয়ে কবেকার সেই শান-বাঁধানো ঘাট যেন কোন্-এক উপহাসকে জানান দিতেই আজও ধ্বংসাবশেষ হয়ে পড়ে আছে। আজ কতদিন পরে যে সে আবার এই ঘাটের সিঁড়িতে এসে বসল, তা মনেও করতে পারল না।

সে লক্ষ করল একটা কালো রঙের প্লাস্টিক জলে ভাসতে ভাসতে ঘাটের সিঁড়িতে বাড়ি খেয়ে চলেছে, আর, একটু দূরেই খবরের কাগজের ছেঁড়া একটা অংশ হাওয়ায় দোল খেতে খেতে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আটকা পড়ে যেন মুক্তি পাবার দুর্দমনীয় ইচ্ছেয় ঝটাপট ঝটাপট শব্দ করতে করতে একসময় হাঁপিয়ে উঠে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে গাছের খোদলে ঢুকে ঝিম মেরে গেল। সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোটার দিকে একভাবে তাকিয়ে তার চোখের সামনে হঠাৎ কতকগুলো অক্ষর স্পষ্ট হতে হতে পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয়ে উঠতে চাইছিল। পতিত তখন আপনমনে সেই অক্ষরগুলোকে জোড়া দিয়ে জোড়া দিয়ে আপনমনেই পড়ে যেতে লাগল। এইসব কথাগুলোকেই কি কিছু আগে ডায়রিটাতে লিখে রেখেছিল সে?

ছোটোবেলায় ঠাকমা আমাকে একজন মানুষের গল্প শুনিয়েছিলেন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উশকোখুশকো চুল, সুঠাম চেহারার সেই মানুষটি ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর ঠাকমা আর বাবাকে সীমান্ত পার করিয়ে এদেশে

রেখে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের দেশে। সেদিন ঠাকমা জেনেছিলেন ও-দেশটা তাঁর নয়। লোকটি ছিলেন মুসলমান। আমার ঠাকমা কোনোদিন জাতপাত ধর্মাধর্ম মানেননি, কিন্তু পুজো-আচ্চা বা হবিষ্যি পালনে ত্রুটি রাখতেন না কখনো।

কিন্তু কথা তা নয়। কথা হলো, পাড়ার লোকে একটি ছেলেকে নাকি ইদানীং প্রায়ই আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরতে দেখেছে। ওদের ধারণা, ছেলেটি মুসলমান। হঠাৎ করে এসে হঠাৎ করেই আবার উবে যায়। লোকেরা ওর চেহারার যে-বর্ণনা দিয়েছিল তাতে আমার মনে হয়েছে ছেলেটি ঠাকমার মুখে-শোনা ওই লোকটির মতন দেখতে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আবার এও বলাবলি করছিল, ওর হাবভাব, চালচলন, এমনকী আদবকায়দা নাকি আমারই মতন। ভেবে অবাক হচ্ছি। এ যেন দু-দুটো ধাঁধা। এক, ঠাকুমার বর্ণিত মানুষটি যদি বেঁচে থাকেন আজও, তিনি কি আর জোয়ান-মদ্দ হয়ে আছেন? কম করে তার বয়েস একশো ছুঁইছুঁই। দুই নম্বর ধাঁধা, এমন একজন ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায়, অথচ আমার সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না কেন? আমিও তো কম ঘুরে বেড়াই না। কোনো বদ মতলব-টতলব নেই তো? ছদ্মবেশী? ভেক? আমাকে কি হেনস্তা করতে চায়

১৪ জুন ২০১২

ঘুরতে ঘুরতে হরেনদার বাড়ির সামনে এসে সামান্য থমকে দাঁড়াল পতিত। হরেনদার খবর নেবার অছিলায় বউমার হাতের তৈরি এক কাপ চা যদি পাওয়া যেত! অবশ্য চা একটা অজুহাত। মেয়েটার দেখা পাওয়াই যে উদ্দেশ্য, সেটা বুঝতে পেরে নিজেরই ওপর করুণা হলো। আশ্চর্য, এই মেয়েটাকে এত কেন তার দেখতে ইচ্ছে করে? কী আছে মেয়েটার মধ্যে যে ওর দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, ওকে দেখলেই ভালো হয়ে যায় মন?

"কোথায় যাও?" পতিত দেখল সামনেই হরেনদা।

"হাইওয়ের দিকে। অনেকদিন আপনার দেখাসাক্ষাৎ নেই। ভাবলাম যদি পথের মধ্যে দেখা পেয়ে যাই তাই এদিকটা একটু ঘুরে যাচ্ছিলাম। কেমন আছেন আপনারা? সব ভালো তো " বানানো কথা বলতে ভালো লাগে না পতিতের, তবু দেখেছে কখনো কখনো কথা বানিয়ে তোলা ছাড়া উপায় থাকে না।

"বেশ তো, এদিকে যখন এসেই পড়েছ, চলো-না ভিতরে গিয়ে দুটো কথা বলি। আমার মনটাও ভালো নেই ক-দিন হলো।"

হরেনদা তাকে বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন শুনে আশ্চর্যই হলো পতিত। "কেন? কারও শরীর খারাপ না কি?"

"না না, নাতি আর বউমা বেশ কিছুদিন হলো বাড়ি নেই, তাই—"

"সে একটু-আধটু তো বাপের বাড়ি যাবেই। তাতে অত মন খারাপ করলে কি চলে হরেনদা?"

"ঠিক তা নয়। ভিতরে চলো, বলছি সব।"

পতিত অবাক হলো। সেইসঙ্গে ভিতরের খবর জানার কৌতূহলও যে সামান্য হচ্ছিল না, তা নয়। তাই কোনো আপত্তি না করে ঢুকেই পড়ল ভিতরে।

"বুঝলে ভাই পতিত, বড়ো পাপ করে ফেলেছি।" ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন হরেনদা। "আমি আর মৃণাল দুই জনেই বউমাকে বড়ো কষ্ট দিয়ে একপ্রকারে বলা যায় ঘর থেকে বেরই করে দিয়েছি। বেচারি আজ প্রায় মাসখানেক হলো সেই-যে বাপের বাড়ি গেছে আর এ-মুখো হওয়ার নামও করে না। মৃণাল বার দু-এক বউমার বাপের বাড়িতে গিয়ে

তার মন ভাঙানোর চেষ্টাও করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি কোনো।"

"আপনারা হঠাৎ ওরকম সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে গেলেন কেন?"

"আমারই ভীমরতি। নিজের মুখে সে-কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না। ক-দিন হলো ভাবছিলাম তোমার কাছে একবারটি যাই। কিন্তু লজ্জায় যেতে পারিনি। ভাগ্য ভালো, তুমিই এসে পড়েছ আজ। তোমাকে বউমা খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; দেখো-না ভাই, আমাদের হয়ে একবার চেষ্টাচরিত্র করে— যদি তাকে ফেরত আনা যায়।"

পতিত চুপ করে থাকে। ভাবে, এ তো হরেনদার পরিবারের ব্যাপার, সেখানে কীই-বা করতে পারে সে? কেনই-বা নিজেকে জড়িয়ে নেবে তার ভিতর? তাছাড়া পুরো ঘটনা না জেনে মেয়েটাকে কোন্ মুখে সে ফিরে আসার অনুরোধ জানাবে?

হরেনদা পতিতকে চুপ থাকতে দেখে হাত দু-খানা চেপে ধরে বলেন, "নাতিটাকে অ্যাদ্দিন ধরে না দেখে আমার ভেতরটা হুহু করে। বউমার বাবা জানিয়েছেন, ডিভোর্সের মামলা ঠুকে খোরপোশ আদায় করে তবে নাকি শেষ দেখে ছাড়বেন। মৃণালের চালচলনও ইদানীং খুব সুবিধার না। প্রায়ই নেশা করতে লেগেছে। পরিবারটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। বড়ো হয়েও আমি তোমার পায়ে পড়ছি, একবার তুমি বউমার সঙ্গে দেখা করো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাকে কিছুতেই সে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না।"

এরপর আর পতিতের পক্ষে 'না' বলা সম্ভব ছিল না। সে বলল, "আচ্ছা, কয়েক দিনের মধ্যেই যাব আমি। কথা দিলাম। আপনি বউমার বাপের বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে একটা কাগজে লিখে দিন।"

হরেনদা ঠিকানা-লেখা কাগজ তার হাতে দিতে দিতে বললেন, "আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি পতিত, বউমার সঙ্গে আর কখনো কোনো দুর্ব্যবহার করব না।"

হরেনদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পতিত সোজা নিতাইদার দোকানে এসে বসল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার মনে হলো দোকানঘরটার ভিতরে বেশ একটা জেল্লা দেখা যাচ্ছে— নতুন রঙের পোচ পড়েছে। উনুনের বদলে গ্যাস-আভেন বসেছে। কাঠের উপর অ্যালুমিনিয়ামের শিট মুড়ে তৈরি পুরোনো ভাঙা চা-টেবিলের বদলে ব্ল্যাক মার্বেল আর, বাঁশের খুঁটির উপর

পর পর শক্ত মোটা বাতা দিয়ে বানানো খদ্দের বসবার জায়গার পরিবর্তে পালিশ-করা কাঠের শক্তপোক্ত বেঞ্চি।

"বাঃ, ভালো সাজিয়েছ তো দোকানখানা নিতাইদা! এবার থেকে শুধু চা-বিস্কুট ছেড়ে নতুন দু-একটা আইটেম চালু করলেই তো হয়।" বলল পতিত।

"তুমি তো অনেক দিন পর আইলা পতিত। এ আর কী দেখো! একবার কেলাবের ভিতরে ঢুইকা দেইখা আসো। চক্ষু ছানাবড়া হইয়া যাইব। সরকার থিকা গ্রান্ট পাইছে। হরনাথ লোকাল এমএলএ-রে ধইরা সব ব্যবস্থা কইরা দিছে। পাকা দালান। সিলিং ফ্যান। ক্যারাম। মাল্টিজিম। অ্যাহন তো পাড়া বে-পাড়ার বড়োলোকের বউ-বিটিরাও আইতাছে। তবে তাগোর টাইম আলাদা।"

"তাই নাকি?" পতিত নিতাইদাকে উৎসাহ দেখিয়ে বলে।

নিতাইদা গরম জলে গ্লাস ধুতে ধুতে বলে চলে, "কেলাবের ছেলেগুলান তো একদিন আমারে এসে কয়, অ্যামন ভাঙাচোরা দোকানের জইন্য নাকি পাড়ার পেস্টিজের এক্কেরে টায়ারপাংচার। হরনাথ পোদ্দারও কয়, ঠিকই তো। আমি বলি, দোকান চেকনাই করুম তার পইসা কই। হরনাথ বলে, ব্যাঙ্কের থিকা লোন করো। আমি বলি, যদি লোন শোধ না দিবার পারি? সে বলে, আমি গ্যারান্টো হব। একদিন তো কোপারটিভ না কোথার থিকা চোদ্দো হাজার টাকা আইন্না আমারে হাতে ধরায় দিয়া কইল, তিন সাল মাসিক সাতশো টাকা কইরা শোধ দিলেই হইব। ব্যস, কেলাবের ছেলেগুলানও সঙ্গে সঙ্গে পিছনে লাইগা পড়ল, কোথার থেকে মিস্তিরি ধইরা নিজেরাই তদারকি কইরা দোকানটারে এমন সাজায়ে তুলল। দু-এক-দিনের মইধ্যে একখান সাইনবোর্ডও নাকি দোকানের মাথায় ঝুলায় দেবে: নিত্য প্রিয় কাফে।"

"তোমার নাম আবার কবে থেকে নিতাই থেকে নিত্যপ্রিয় হলো?"

"আমার ভালো নাম তো হইল নিত্যানন্দ। ঠাকমার দেয়া নাম। বাড়িতে ছোটো কইরা সবাই নিত্য বা নেত্য বইলা ডাক পাড়ত। হেইটাই শেষে পাড়ায় লোকের মুখে মুখে হইল নিতাই বা নেতাই। দোকানের নামখানা তুমি ভুল বুঝছ। কথাডা নিত্যপ্রিয় না, নিত্য-র পরে গ্যাপ দিয়া প্রিয়।"

"উরিব্বাস! যে নাম দিয়েছে সে তো পণ্ডিত মানুষ গো। কিন্তু কাফে কি এইখানে চলে? কাফে শব্দটার অর্থ তো ঠিক চা-কফির দোকান নয়।"

"আমিও তোমার মতন মনোতোষদার নাতনিরে কইছিলাম, ওসব বিদেশি নাম কি চলব এই কলোনি পাড়ায়? সে কয়, কলোনি কথাটাই নাকি আর চলে না। এ হইল মোবাইলের যুগ, নেটের যুগ। গেরাম-শহর নাকি সব এক হইয়া গেছে।"

"মনোতোষদার নাতনি তো দেখছি খুবই স্মার্ট। কিন্তু তাকে তো বলতে হতো যে, তুমি চা-কফি বেচলেও স্ন্যাক্স-ভাজাভুজি-চপ-কাটলেট বেচো না।"

"বেচি তো।"

"বলো কী!"

"খাইবা নাকি এক কাপ কফি সঙ্গে ডিমের ভুজিয়া বা অমলেট। বানাই?"

"অ-ম-লে-ট ! না না, অমলেট-টমলেট বাদ দাও। শুধু কফি।"

নিতাইদা চটপট কফি বানিয়ে চায়ের গ্লাসের বদলে নতুন কাপ-ডিশে করে পতিতের দিকে বাড়িয়ে ধরে। দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে হেসে নেয় একচোট। কফিতে চুমুক দিয়ে পতিত তখন বলে, "সবই তো হলো। কিন্তু হরনাথ কোনো কাগজে-টাগজে তোমার সইসাবুদ নেয়নি?"

"তা তো নিবই। কোন্ হালায় আইজকাল মাগনা পীরিত দ্যাখায়?"

"কাজটা ঠিক করোনি দাদা।"

"কোন্ কাজটা ঠিক করেনি পতিতকাকা?" পতিত দেখল ক্লাবের কেস্টা-পল্টুর সঙ্গে হরনাথের ছোটো ছেলে কিশোরও এসে ঢুকেছে দোকানে। কথাটা কিশোরই বলল।

বিপিনের বউ কি ফিরে এসেছে তবে? ঝটিতি মনে হলো পতিতের।

কিন্তু তাকে বেশি ভাবনার সুযোগ না দিয়ে কিশোর ফের বলে উঠল, "লোকের ভালো দেখলে তোমার চোখ টাটায় নাকি পতিতকা? কোথায় খুশি হবে, তা নয়, গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর কান ভাঙাতে লেগে গেছ? ছিঃ!"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো! তোমায় আবার এ কোন্ রোগে পেল পতিতদা? নিতাইদার উপর অতই যদি দরদ তো টাকাটা তুমিই দিয়ে দাও-না কেন? ল্যাঠা চুকে যায়।" কেস্টা বলল।

"আমি তো কারও নামে কিছু বলিনি। নিতাইদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার, তোরা এর মধ্যে কথা বলছিস কেন?"

"আলবাত বলবে। তুমি শালা কাঠিবাজি করবে আর আমরা তোমায় ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করব?" কিশোর রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

"বড়োদের লগে ভালো কইরা কথা কইতে কি তোমার অসুবিধা হয় কিশোর?" কোথার থেকে মাছ-বিপিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"আঃ সক্কলে মিইল্লা কী হট্টগোলের ফ্যাচাং পাড়োস এইহানে! থামা তো এইসব?" নিতাইদা বিরক্ত হয়।

"শালার ধ্বজ, বউটারে ঠিক রাখতে পারে না, এখন এসেছে পতিতকার হয়ে সালিশি করতে। বাবাকে বলে অ্যামন বাম্বু দেয়াব না পালিয়ে পথ পাবি না।"

"আমার বউ কী করে তাই দিয়া তোর বাপের কী। তুমি শালা যে আমার বউটার পাছায় পাছায় ঘুইরা বেড়াও, সে কি জানতে বাকি আছে কারও? সে-মেয়েমানুষ তোমার খায় না পরে যে, তার হাগা-মোতার গন্ধ শুইক্কা ফেরো?"

"এই শালা বিপিনের বাচ্চা! তোর জিভ আমি ছিঁড়ে ফেলব।" গর্জে ওঠে কিশোর।

পতিত দেখল কোথার থেকে বিপিনের বউ একখানা বটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। "আয় দেখি কত ক্ষমতা হয়েছে তোর। কেমন করে জিভ ছিঁড়িস তুই। এই বটির এক কোপে ধড়-মুন্ডু যদি আলাদা না করেছি তো আমিও বাপের বেটি নই।"

কিশোর ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়ায়। দূর থেকে বলে, "দাঁড়া রে খানকি মাগি, তোদের দুটোকেই যদি পাড়াছাড়া না করেছি তো আমিও কিশোর পোদ্দার নই। দেখব তখন কোন্ গান্ডু এসে বাঁচায় তোদের?"

পতিত দেখল বিপিনের বউ বটি উঁচিয়ে কিশোরকে তাড়া লাগিয়েছে আর, বিপদ বুঝে নিমেষে কিশোর আর দলবল যে-যার একে একে সটকে পড়তে লেগেছে।

"যা যাঃ! পোদু-চোদু-পুলিশ-আমলা-এমএলএ-এমপি সবার কাছে যা। থেকে থেকে গুষ্টিসুদ্ধ তোরা পয়সা আর পাওয়ার দ্যাখাস, না? সব মানুষকে ভাবিস গোলাম। যেন তোদের কথায় উঠবে আর বসবে। খ্যাপা মানুষের সামনে পড়িসনি তো কোনোদিন, তাই অত তড়পানি। আজ থেকে এ-অঞ্চলে ঢুকলে পিটিয়ে সোজা করে দেব। শাল্-লা!" 'শাল্-লা' কথাটা উচ্চারণ

করে এতটাই চেঁচিয়ে ওঠে পতিত যে, মনে মনে ভাবে, তাই তো! সেই কি উচ্চারণ করল কথাগুলো? না কি অন্য কেউ? আশে-পাশের সব কিছুতে চোখ বোলাতে বোলাতে ধন্দ লাগে; দেখে দু-একজন খরিদ্দার যারা বসে বা দাঁড়িয়ে তাদের কারোই হেলদোল নেই কোনো। এমনকী নিতাইদাও আপনমনে একটার পর একটা কাপ ধুয়ে উপুড় করে রেখে চলেছে মার্বেলের তাকটার উপর। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তখন পতিতের নজরে পড়ে সাইকেলের পিছনের সিটে মাছের খালি ডাব্বা নিয়ে নিতাইদার দোকান পেরিয়ে বিপিন ওর বাড়ির দিকে চলেছে। তাই তো! বেলা কি এতটাই গড়িয়ে গেল?

"আজ রাত্তিরের মেনু কী, পতিতদা?" পশ্চিমের বৈঠকখানার ঘরে ঢুকে পতিতের উলটোদিকের সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল পাবন।

হ্যাঁ, সন্ধ্যে পেরুতেই সে-ছোঁড়া ফের হাজির। না, ক্লাবের ছেলেগুলোকে আজ পাবনের ব্যাপারে সে কিছু বলে উঠতে পারেনি। তার মনে হয়েছে ব্যাপারটা বেশি চাউর হলে হরনাথের মতো সর্বঘটের বেলপাতারাও জুটে যাবে, আর তাকে পরামর্শ দেবার নামে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।

পতিত তখন একটা বই পড়ছিল। বইয়ের থেকে মুখ না তুলে একান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর করল সে: "রুটি, মুসুর ডাল আর সেই সঙ্গে মুরগির ডিমের কষা।"

"বাঃ, চমৎকার! খেতে বসার আগে দুটো কাজের কথা হয়ে যাক বরং। কী বল পতিতদা?" আশ্চর্য, পরিচয়ের চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি, ছেলেটা পতিতকে 'তুমি' সম্বোধন করতে শুরু করে দিয়েছে !

"কাজ!" বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অবাক বিস্ময়ে সে তাকাল পাবনের দিকে।

"হ্যাঁ কাজ। লোকেরা যে গালমন্দ করে তুমি কোনো কাজকম্ম না করে ধর্মের ষাঁড় হয়ে এদিকে-ওদিকে এ-গলি সে-গলি ঘুরে বেড়াও, বাবার জমানো টাকায় দিব্যি বসে বসে খাও। এসব শুনতে ভালো লাগে?"

"তা কী করতে বল তুমি? এ-বয়েসে কি কেউ চাকরি দেবে আমায়?" বইটা ভাঁজ করে সেন্টার টেবিলের উপর রেখে পতিতও ওকে 'তুমি' সম্বোধনে বলতে শুরু করে দিল।

"চাকরি ছাড়াও তো হাজার-একটা কাজ আছে।"

"কেনা-বেচা ইধার কা মাল উধার? সুদের কারবার তোমার মতলবটা কী, খুলে বল তো! তবে জেনে রেখো, কোনো দু-নম্বরি হবে না আমার দ্বারা।

"ধুস, তোমাকে ও-কাজ কেউ ভুলেও সাধবে ভেবেছ নাকি?"

"তবে?"

"এই ধরো, হাতের কাজ। ঘরে বসে মেয়েদের সেলাইয়ের মতো। যেমন,

হাতে লিখে বা টাইপ করে কপি করা। বা প্রুফ সংশোধন। কিংবা ডিজাইন-টিজাইনের কাজ। তুমি তো ছোটোবেলায় ভালোই ছবি নকল করতে পারতে। তোমার ঘরে সেসবের দু-একটা নমুনাও দেখলাম। বেশ ভালো।"

"এগুলোর কোনোটাই কি আর ধৈর্য নিয়ে করে উঠতে পারব এ-বয়েসে? পারলেও, কে দেবে সেই কাজ?"

"আলবাত পারবে। কাজ আপনি জোগাড় হয়ে যাবে। একখানা কম্পিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়া কিছু লাগবে না। চটপট বন্দোবস্ত করে ফেলো দেখি। আমিই শিখিয়ে-পড়িয়ে দেব।"

"বই পড়ে সেসব আমি খুব শিখে নিতে পারব। শুনেছি, চেষ্টা থাকলে আজকাল ইন্টারনেট থেকেই অনেক কিছু শিখে নেয়া যায়। কারুকে দরকার লাগে না। এখন কাজের জোগাড় হবে কী করে বরং সেই কথা বলো।"

"সে-ও ইন্টারনেটেই পেয়ে যাবে ঠিক। জরুরি হলো শুরু করাটা।" কথাটা বলে পাবন তার ডানদিকের দেয়ালে ঝুলে-থাকা ঘড়ির দিকে তাকাল।

তখনই হরনাথদের বাড়ির পুরোনো সাবেকি দেয়ালঘড়িতে রাত দশটার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘড়িটা অ্যান্টিক। 'গিলবার্ট স্যান রেমো মিশন' মডেল। আমেরিকার উইলিয়াম এল গিলবার্ট ক্লক কোম্পানির তৈরি। হরনাথের ঠাকুরদাদার আমলের। ছোটোবেলায় ও-বাড়িতে যখন বেশ যাতায়াত ছিল, অবাক হয়ে পতিত ঘড়িটাকে দেখত। টিকটিক করে পেন্ডুলামটা দুলে দুলে অনবরত সময়ের কথা বলে যেত। তার মনে হতো কত দিনের কত সময়ের হিসেব ওর জানা। মাঝে-মধ্যে ছুঁয়েও দেখেছে ঘড়িটাকে। ওতে ঘণ্টা বেজে উঠলে পতিত খুব বিষণ্ণ হয়ে যেত। কিছু আর ভালো লাগত না তার।

"চলো খেয়ে নেয়া যাক। পরে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত নাহয় আলাপ-আলোচনা করা যাবে।" পাবনের কথার রেশ পতিতকে বিষণ্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা কুকুরের আর্ত চিৎকার তাকে সন্ত্রস্ত করে দিল।

"হ্যাঁ চলো, রাত অনেক হলো।" গলার ভিতর জমে-থাকা শ্লেষ্মা পতিতের কথাগুলোকে ফাঁসিয়ে দিয়ে অদ্ভুত এক চাপা ধ্বনির সঙ্গে নির্গত হয়ে এল। সে খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে শ্লেষ্মাটা গিলে নিল পেটের ভেতর।

খাওয়াদাওয়া শেষে আগের রাতের মতোই পাবন পতিতের ঘরে আর পতিত তার বাবার ঘরে শুতে চলে গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে

পতিতের মনে হলো, শেষে ছেলেটা কিনা তার বেকারত্ব নিয়ে চিন্তিত। আরে বাবা, যে-দেশে নেতারা একশো দিনের কাজের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কাজিয়া করে, চাকরি পাবার বয়েস-সীমাকে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সরকারের সাফল্য বলে গলা ফাটায়, সে-দেশে তার মতো একজন খাইয়ে-পরিয়ে বেকারের কথা ভেবে কী হবে? বরং লক্ষ লক্ষ কর্মহীন কর্মচ্যুত লোকেদের নিয়ে একদিনের জন্যও যদি সব কিছু অচল করে দিতে পারত তো হিম্মত বোঝা যেত। তাছাড়া ও-ছোঁড়া নিজে সারাদিন ধরে কী কর্ম করে বেড়ায়, তা-ও তো খোলসা করে জানায়নি। পতিত নিজে অবশ্য জিগাসা করেনি। জানতে চায়নি কোথায় বাড়ি, কে কে রয়েছে বাড়িতে, কেনই-বা হঠাৎ এ-বাড়িতে রবাহূত এসে পতিতের ব্যক্তি-পরিসরে দখলদারি করতে লেগেছে। পাবনকে ঘিরে এই কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগত, তবু কেন জানি পতিতের সেইসব জেনে নিতে তেমন উৎসাহ হয়নি। বরং ওর চলনবলন, খাওয়ার ভঙ্গিমা, রুটিকে ছিঁড়ে তার টুকরোগুলোকে একটা একটা করে ডালের মধ্যে ভিজিয়ে নিয়ে মুখের ভিতর চালান করতে করতে ধীরে ধীরে চিবুনো, বাঁ-হাত দিয়ে কখনো-বা মাথা চুলকাতে চুলকাতে কপালের উপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলোকে ঘন ঘন পিছন দিকে ঠেলে অবিন্যস্ত করে দেয়া; আবার কখনো ঝুঁকে, কখনো-বা সটান বসে চেয়ারকে আগু-পিছু করা, খাওয়া-দাওয়া শেষে থালা-বাটি-গ্লাস বেসিনে নিয়ে সাবানে সাফসুতরো করে একটা পরিষ্কার কাপড়ে মুছে নিয়ে বাসনকোসনের র‍্যাকে সযত্নে সাজিয়ে রাখা, সবশেষে হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য মুচকি হেসে শোবার ঘরের দিকে চলে যাওয়া—এইসব— এই সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করাতেই আগ্রহ হয়েছে বেশি। ছোটোবেলা মানুষের কাজ করা দেখতে তার শুধু ভালোই লাগত না, একটা সম্ভ্রম জেগে উঠত মনে মনে। এই-যে পাবনের জবরদখলি পতিতের একলার আপাত অগোছালো সংসারে, এমনকী তার দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত ঘরখানির উপরেও, একরাশ বিরক্তি আর অসহায়তা সত্ত্বেও পতিত উত্তেজিত হতে বা রেগে উঠতেও পারল না তবু, পারল না ছেলেটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে; কেন? সেটা কি ওর গুছিয়ে কাজ করাটা দেখতে দেখতে পতিতের মনে একটা সম্ভ্রম জেগে উঠেছিল বলে? না কি নির্বিবাদী মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে আসলে সে আরও বড়ো ধরনের উত্তেজনার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে থাকে?

কত অনায়াসে ছেলেটা পতিতের ব্যক্তিগত ব্যাপারে শুধু ঢুকেই পড়ছে

না, উপদেশ দেওয়াও শুরু করে দিয়েছে। তাহলে পতিতেরই-বা জিজ্ঞাসায় দোষ কোথায়: সারাদিন কী করে ও, কী চায় তার কাছে, কীসে ওর আগ্রহ, কেনই-বা পতিতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ভিতরে নানা ছুতোনাতায় নাক গলাতে চাইছে? এক্ষেত্রে পতিতের ভূমিকা কি তবে কোনো যাত্রাভিনয়ে মঞ্চের ওপর একপাশে বসে-থাকা বাজনদার দলের একজন হিসেবে? দৃশ্যাবহ রচনার কাজে সহায়তা করে চলা শুধু? পতিত কি কোনোদিন চরিত্র হয়ে উঠবে না? না কি কুশীলব হয়ে-ওঠা তার পক্ষে সম্ভবই নয়? তবে কি সে পতিত-ই হয়ে উঠতে পারেনি আজও? কোনো-এক না-পতিতের ভগ্নাংশ হয়ে বেঁচেবর্তে আছে এতকাল? আর তাই, পাবন ছোঁড়াটা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারই বাড়িতে অনুপ্রবেশকারী হয়েও সমস্ত কিছুতে দখলদারি দেখানোর মতো ক্রমশই বেশি বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠছে?

হঠাৎ রাতচরা কোনো পাখির ডাকে এইসব ভাবনার আলস্য ভেঙে গেল পতিতের। বিছানা ছেড়ে সে প্রথমে বাথরুমে গেল; ফিরে তৃপ্তিভরে খাবার টেবিলের উপরে রাখা জলের বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর কী মনে করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল নিজের ঘরের দিকে, এই দুই দিন পাবন যার দখল নিয়েছে। কেন জানি পতিতের খুব জানতে ইচ্ছে করছিল ছেলেটা ঘুমিয়েই পড়েছে, না কি তারই মতো ভাবনার গভীরে জেগে থেকে সময়ের আলস্যের ভিতর বসে আছে নিশ্চল হয়ে? না কি পতিতের জিনিসপত্র ঘেঁটে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে চাইছে কিছু? দরজার কাছে এসে সামান্য দ্বিধান্বিত হলো, দেবে কি উঁকি? একবার ভাবল, গোপনে গুপ্তচরের মতো এভাবে উচিত কি কারও উপর নজরদারি করা? মনে হলো, কোনো মানুষের গোপনীয়তা যদি প্রকাশ্য হয়ে পড়ে, তখন তার পরিচয় কি অচেনা হয়ে যায় না? মানুষটি কি সরে যায় না দূরে? একইসঙ্গে বিরক্তি আর সহিষ্ণুতার মিলমিশে পাবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে পতিতের যে-সম্পর্ক গড়ে উঠছে, কোথাও তার সুর-তাল কেটে যাবে না তো? এমনকী, হয়তো-বা ঘটেও যেতে পারে বিপর্যয় কোনো! আচ্ছা, বিপর্যয়ের চিন্তাটা কেন মনে এল পতিতের? তবুও, কোন্-এক অমোঘ আকর্ষণে আরও এগিয়েই গেল সে দরজার দিকে। ভাবল, পাবনও তো না বলে তার ডায়রি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। আশ্চর্য, নিজেরই বাড়িতে তার নিজেকেই কিনা অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে হচ্ছে! এরকম এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনা জুড়ে জুড়ে নিজের

সঙ্গে নিজেরই পতিতের আরও কিছু সময় ধরে স্বগত আলাপ চলছিল।

নিজে ১: ঘাঁটাঘাঁটির ব্যাপারটা টের পেয়েও ডায়রিটাকে তবু কেন সে ও-ঘরের থেকে আজ সারাদিনে সরিয়ে ফেলেনি?
নিজে ২: তবে কি পতিত চাইছিল পাবন পড়ুক ওর লেখা?
নিজে ১: ইচ্ছে হলে দু-চার কথা নাহয় লিখেও রাখুক।
নিজে ২: লুকিয়ে লুকিয়ে সেই কথাগুলো পড়তে পড়তে হয়তো সেও নতুন করে লিখতে চাইবে কিছু।

এবং এম্‌নি করে, হয়তো এক পতিতপাবনের থেকে দুই পতিতপাবনের একান্ত আলাপচারিতা জমে উঠবে। সেই কথা-চালাচালিতে যে-চিত্রনাট্যের নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠবে, তার ফলে, তারা দুই কুশীলব ক্রমে সে-রচনার কাটাকুটি খেলায় মেতে একে অপরের উপর ভর হয়ে জটিল করে তুলবে পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রাসঙ্গিকতা, সত্যাসত্য, সহাবস্থান। আর সেই নির্মাণের ভিতর দিয়ে ক্রমশ একসময় পতিত সত্যি সত্যিই হয়তো এক চরিত্র হয়ে উঠবে। পূর্ণ হতে চাইবে।

দরোজা সামান্য ফাঁক করাই ছিল। পতিত সেই ফাঁকটুকু অনুসরণ করে তার দৃষ্টিকে বিস্তৃত করে নিতে চাইল। ঘরের ভিতরকার আলো-অন্ধকার মাখামাখি যে-দৃশ্যলোক ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকল তার মননে, তাকে অনায়াসে যেন সে চিত্রকরের মতো কাগজের উপর তুলি দিয়ে নানা রেখার টানে গড়ে নিতে পারল: টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছে পাবন, কিছু একটা লিখে চলেছে; টেবিলের উপরে ডায়রিটা পড়ে, ডান হাতে ধরা পার্কার পেন; টেবিলল্যাম্পের শেড একটু বেশিই ঝুঁকে আছে, আলোটা সীমিত জায়গার ভিতর পড়ে লাফ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে পড়েছে; একটা টিকটিকি দেয়ালের উপরে ঝুলানো ফটোর পিছনে দেহের আদ্ধেক রেখে বাকি আধখানা থেকে বেরিয়ে স্থির হয়ে আছে শিকারের অপেক্ষায়।

ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয় ডায়রি আর পার্কার পেন। কিন্তু পতিতের এই অভব্যতায় ছেলেটা রুষ্ট হয় যদি? তার এমন আচরণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মুষড়ে পড়ে খুব তখন কী সান্ত্বনা দেবে ওকে? নিজেকেই-বা কী স্তোক দেবে? কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তার এই লুকিয়ে লুকিয়ে নজরদারিকে? ব্যাপারটা তো শোভন নয় ঠিক। তখন কিছুটা সময়

চুপটি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে আত্মস্থ করে নিতে চাইল। ক্রমশ ঘরের মধ্যেকার আরও নানা কিছু স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকল। তাতে এতক্ষণের ক্ষুব্ধ মনোভাব সরে গিয়ে বরং কৌতূহল বড়ো হয়ে উঠল। মনে হলো পুরো ঘরের অবস্থান জুড়ে যেন এক বিভ্রান্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে চাইছে। (বিভ্রান্তি না বিলোপ?) দেখল, তার ব্যবহৃত আসবাব, দেয়ালে- টাঙানো- ফোটোগ্রাফ, দেয়ালের রং, বিছানা-বালিশ-চাদর, ক্যালেন্ডারের পাতা, টেবিলল্যাম্প প্রভৃতি এতকাল ধরে যেভাবে দৃশ্যায়িত হয়ে এসেছে পতিতের অভ্যস্ত যাপনের ভিতর, তার সঙ্গো এখনকার আদলের কোনো মিলই নেই যেন। সবের থেকে মায়ামমতাটুকু বা আবেগঘন মন্ময়তা বা ছোটো-বড়ো নানা মুহূর্ত, এমনকী ওইসব বস্তুগুলির থেকে পতিতের প্রতিদিনের রক্তমাংসের অস্তিত্বটাই গিয়েছে উবে। ভাবল, এসব কি তার উদ্ভট কল্পনা? তবে কি পাবনের প্রতি ক্রমশ তার দুর্বল হয়ে পড়াটাকেই প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে এইসব ভাবনাবিলাস? যেন ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিতে চেয়ে উদ্ভট যত উপমা এসে ভিড় জমিয়েছে মাথার ভিতর! খোলা ডায়রির ওই পাতা আপনা-আপনি এক যোগসূত্র গড়ে তুলতে চাইছে তাদের ভিতর। আর তাই, এখন সে পীপিং টমের মতো দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করে যাচ্ছে পাবনকে!

টম। কে এই টম? অশ্বারূঢ় নগ্ন লেডি গোদিভাকে দেখে ফেলেছিল যে-কিশোর-টম? না কি টম ডিক হ্যারি-র টম সয়্যার টম না কি টম দা পতিতপাবন?

একসময় ফিরে এল শোবার ঘরে। কী যেন একটা খোঁজার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। দরকারি কিছু কি? কে জানে! খুবসম্ভব কোনো ফোটোগ্রাফ। অনেক অনেক দিন আগে যেই ফোটোগ্রাফটির মধ্যে দেখেছিল অপরিচিত একজনকে। সেই মুখ হঠাৎ যেন দারুণ স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল স্মৃতিতে। সেটা ছিল একটা ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফ। চরিত্ররা হলেন ঠাকুরদার মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, বাবা, অল্প বয়সে মারা যাওয়া পিসি, আর অপরিচিত ওই মানুষটি। লোকটার মুখের সঙ্গো পাবনের যেন কোথায় একটা মিল আছে। হুবহু না হলেও, বিশেষ করে চোখ দুটোর।

পতিত এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ছবিটাকে। খুঁজে পেতেই হবে। মিলের

ব্যাপারটা যে কোনো অমূলক সন্দেহ নয়, সেটা প্রমাণ হওয়া চাই। নইলে স্বস্তি পাবে না। দেখতে দেখতে খোঁজার চোটে বাবার ঘরটা ওলটপালট আর লন্ডভন্ডই হয়ে গেল বলা চলে। কিন্তু কোত্থাও পাওয়া গেল না সেটা। ধীরে ধীরে যখন দু-চোখে ক্লান্তি নেমে হাই উঠছিল, একটা চটি বই, মলাটবিহীন পৃষ্ঠাগুলো সবই খুলে খুলে গেছে, উঠে এল তার হাতে। আনমনে মাঝখান থেকে একটা লেখায় চোখ বোলাতে বোলাতে পতিত বুঝে উঠতে পারল না কী ধরনের রচনা সেটি। এ-ভাষার সঙ্গো সে পরিচিত নয়, যদিও তা বাংলাই। দেখতে দেখতে প্রথম থেকে শেষ অবধি সবটুকুই পড়ে ফেলল সে। ঘোরের মতো। স্বপ্ন-দেখার মতো।

কিন্তু প্রশ্ন, কে বইটির লেখক? অনেক উলটে-পালটেও লেখকের বা বইয়ের নাম উদ্ধার করতে পারল না সে। বইটিকে 'তোমাকে দিলাম' বলে কাকেই-বা উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন সেই অজ্ঞাতকুলশীল লেখক? ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুয়ে শুয়ে পতিত 'দৃশ্য ও অন্তরাল' শিরোনামের একটি লেখার মাঝখান থেকে কয়েকটি লাইন আবারও পড়ল:

তুমি ঝুঁকে পড়লে আমি আল্লাহ্‌কে ডাকি, বলি, হে খোদা, আপনার
জন্যই তো এইসব:
নিজেকে ছেনেছুনে, নিজেকেই লজ্জাবনত ক্রমশ ভারহীন শূন্যতার
কীভাবে নেবে যাই নীচে।
গোলকধাঁধার মতো যে-উষ্ণালোক জড়িয়ে যাচ্ছে হাতে, পায়ে,
পেটের ভিতর, তোমাকেও—
মনে হয়, শ্বাসের অনুভাবে স্বেদবিন্দুগুলি বায়বীয় ক্রমে, ভেসে
ভেসে উড়ে চলেছে;
যেন হরিণীর মুদ্রায় আরোই ঝুঁকে এলে তুমি, দুই হাঁটু মুড়ে,
আলুলায়িত চুলের বিভবে, আর
তক্ষুনি বলে উঠি আমি, হা ঈশ্বর, ক্ষমা করো, ক্ষমা নয়তো ঈর্ষা
নয় মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যুই সই—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরেনদাকে কথা দিয়েছি, তাই ভাবছি দু-একদিনের মধ্যেই একবার সঞ্চিতার বাপের বাড়ি ঘুরে আসব। অবাক হচ্ছি, এমন কী ঘটল যে, সেই মিষ্টি শান্ত মেয়েটা গৃহত্যাগের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল? হরেনদার দেয়া ঠিকানার হিসেবে সেই বাড়ি এখান থেকে খুব-একটা দূরে নয়, এক বেলাতেই ঘুরে আসা সম্ভব। কিন্তু বিপদ হলো, ওর বাবা-মাকে কী বলব সেটা ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। আমার অনুরোধকে যদি ওঁদের অনধিকারচর্চা বলে মনে হয়?
২৭ জুন ২০১২

অনেক অনেক দিন পর গতকাল সন্ধ্যেয় ডায়রির বিবর্ণ হয়ে-যাওয়া ফাঁকা পৃষ্ঠায় কী লিখবে কী লিখবে ভাবতে ভাবতে সেই পার্কার পেনটা দিয়ে এই কথা ক-টাই লিখতে পেরেছিল পতিত। আজ সকালে আবারও পাবন না বলে-কয়ে বেপাত্তা হয়ে যেতে ড্রয়ারের থেকে সেটা বের করে পাতাগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে পতিত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মনে হলো, এ তো ভারি অন্যায়, ছেলেটা ক্রমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর ভিতর ঢুকে অযথা বিব্রত করে তুলতে চাইছে তাকে! খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার অতীত, বর্তমান সব কিছুকে যথেচ্ছ আমোদের বিষয় করে তুলতে চাইছে যেন। নইলে পাতায় পাতায় কেন পেনসিল দেগে, কখনো কখনো এমনকী টিপ্পনী পর্যন্ত লিখে রেখে দিয়েছে? যেমন ধরা যাক—

১. ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১:

এখন ক-টা বাজে জানি নে। সম্ভবত রাত একটা বেজে মিনিট দশ-পনেরো হবে। কেননা কিছু আগেই হরনাথদের দেয়ালঘড়িতে একটা বাজার ঢং শুনতে পেয়েছি। মা পাশের চকি থেকে জেগে উঠে বললেন, "অনেক রাত হলো, এবারে ঘুমো পতিত।"

পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। এদিকে আমার বাঁ-চোখ বেশ ভোগাচ্ছে।

বাড়ির কাউকে জানাইনি সে-উপসর্গের কথা। মনে মনে ভেবে রেখেছি পরীক্ষা মিটলেই ডাক্তার দেখাব।

পলিদির কাছে সেতার শুনব মনে করে গিয়েছিলাম আজ। কিন্তু ইদানীং একেবারেই আর সেতার বাজায় না পলিদি।

একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এখন চুপ। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁদের কলরব চারদিকের নীরবতাকে আরও যেন জানান দিচ্ছে। এবার ঘুমুব।

'সেতার' শব্দের নীচে পেনসিলের দাগ আর পুরো লেখাটার তলায় পাবনের টিপ্পনী: 'সেতার... সাতটি তার... স্বপ্তস্বর... সরগম... সা রে গা মা পা ধা নি।'

২. ১২ই ডিসেম্বর ১৯৮১:

রেডিয়োয় রবীন্দ্রসংগীত: 'মেঘ বলেছে যাব যাব'। শুয়ে শুয়ে একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঠান্ডা উপভোগ করছি। গত তিন দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। এই মুহূর্তে বাইরে চারদিক উপচে-পড়া ঝলমলানো জ্যোৎস্না দেখলে কে বলবে ক-দিন কী বর্ষাই-না হয়েছিল!

আজ বিকেলে পলিদি আর ওর এক মামাতো বোনকে সঙ্গে করে ধোবিঘাট গিয়েছিলাম। পড়ন্ত বেলায় ভাসমান একটা নৌকোর সিল্যুয়েটে চোখ আটকে গিয়েছিল; হঠাৎ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম চারপাশ থেকে। সূর্য তখন ডুবছে, আমার মনে হলো, শেষ আলোটুকুকে শুষে নিয়ে একা পড়ে আছি কোনো সমুদ্রের তীরে।

"কী রে পতা, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বাড়ি যাবি না?"

খুব ইচ্ছে করছিল একটা নৌকোয় চেপে গঙ্গার উপরে একটু ঘুরে আসি, কিন্তু হলো না তা।

বাড়ি ফেরার পথে মুচকি হেসে কানে কানে পলিদি বলেছিল: "আমার বোনকে কেমন লাগল রে তোর? মিষ্টি না তেতো?"

কথাটা শুনে কেমন যেন হুহু করে উঠেছিল আমার বুকের ভেতর।

এক্ষেত্রে পাবন শেষ লাইনের অন্তে লিখে রেখেছে: 'প্রস্থান— সেও তো আসলে প্রবেশের অছিলা মাত্র।'

৩. ১৯শে জানুয়ারি ১৯৮২:

আজ সারা দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট। সব কিছু অচল হয়ে আছে। ক-দিন যাবৎ মিছিল-মিটিং-স্লোগানে গমগম করে ছিল পাড়া থেকে পাড়া, স্টেশন রোড, বাজার।

ইদানীং পলাশ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝেই এসে ওর বাঙাল ভাষায় বক্তৃতা ছোটায়। বলে, "বিপ্লব ছাড়া গরিবের মুক্তি নাই রে পতা। চাই বিপ্লব। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।" বেশ প্রাণবন্ত লাগে তখন ওকে।

সন্ধ্যাবেলা সাইকেলে করে ঘুরে এলাম এদিক-ওদিক। দোকানপাট, বাজার, বাস-ট্রেন-রিকশা সব বন্ধ। বাড়ির কাছে এসে দেখি গেটের সামনে পলিদি আর মা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। সাইকেল থেকে নেমে ইচ্ছে করেই আড়াল নিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে পলিদি এদিকে আসতেই স-সাইকেল হাজির হলাম ওর সামনে।

"মার সঙ্গে কী অত কথা হচ্ছিল পলিদি?"

"তুই লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলি নাকি সব?"

"আমার সে-স্বভাব নয়।" বললাম ওকে। একটু রাগ দেখিয়েই।

"অন্য একদিন বলব সে-কথা। রাত হয়েছে। বাড়িতে চিন্তা করবে। এখন যাই।"

চলে গেল পলিদি। আমিও ফিরে এলাম বাড়ি। ফিরে টের পেলাম বাড়ির পরিবেশ একটু যেন থমথমে। বাবা-মা দু-জনেই বেশ গম্ভীর। আমিও উচ্চবাচ্য না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে চটপট মশারির ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘুম আসছিল না। দস্তয়েভস্কি-র দা ইডিয়ট পড়ছিলাম। আশ্চর্য মনে হয় আমার নিকোলিয়েভিচ মিশকিনকে।

পাবন 'অত কথা', 'পলিদি', 'দা ইডিয়ট' 'আশ্চর্য' আর 'মিশকিন'—এই শব্দগুলোর তলায় দাগ দিয়ে একপাশে লিখে রেখেছে 'মামাতো বোন'।

পঞ্চাশ-ছুঁইছুঁই পতিতের কাছ থেকে কী চায় পাবন? পতিতের প্রত্যেক দিনের বেঁচে থাকার মধ্যে যে-নিঃসঙ্গ-অলস, যে-উৎসুক-দর্শক, যে-অগোছালো-ভাবুক আয়ুক্ষয় করে চলেছে প্রতিনিয়ত, সেই পতিতপাবন বাগচি-র জীবনে ছেলেটা কোন্ সোনার কাঠির কোন্ রুপোর কাঠির খোঁচায় স্মৃতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিতে চায় তাকে? এক প্রবল প্রত্যাখ্যান, এক

উত্তেজক অস্বীকার তাকে তখন-তখনই সেই ডায়রিতে দু-একটি কথা লিখে রাখতে যেন উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে:

> *যে-জীবন অন্যের (এমনকী যদি তা নিজের অতীতেরও হয়), তাকে ঘিরে আগ্রহ অস্বাভাবিক নয় ঠিক, তবু তার কাটাছেঁড়া কেন? রোমান্টিসিজম, চিয়ার্স অনুভূতি তো একইসঙ্গে বিপর্যয়ের পাশে পাশেই থাকে। শৃঙ্খলা ভেঙে গেলে শুধু বিশৃঙ্খলই হয়ে পড়ে না সব কিছু, হিংসা আর ঈর্ষাকেও ডেকে আনে তা। স্মৃতির ভিতরে সেই অস্থিরতার চাপ অসহ্য হয়ে উঠলে সহজ থাকে না কিছু; ঘটনাও আর ঘটনা থাকে না, দুর্ঘটনা হয়ে উঠতে পারে অচিরেই, চূড়ান্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ।*
>
> *৪ জুলাই ২০১২*

পাবনের সঙ্গে আজই রাত্তিরে বসে একটা বোঝাপড়া সেরে নেওয়া দরকার। তার জীবনের খুঁটিনাটিতে ছেলেটার এই অনধিকার প্রবেশ কোনোভাবেই আর মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এখানে থাকতে হলে পাবনকে স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে তা। না বুঝতে চাইলে বুঝিয়েই দিতে হবে। ভাবল পতিত। এমন সময় দীপালিদি এসে বলল, "সেই কখন থিক্কা টেবিলে জলখাবার দিয়া ডাকত্যাছি, কিন্তু তোমার সাড়াশব্দই নাই। ব্যাপার কী?"

"তা-ই? ইশ্! আচ্ছা, তুমি যাও। আমি এক্ষুনি আসছি।" পতিত ডায়রিটা চটপট ড্রয়ারে লুকোতে লুকোতে বলল।

"একটা কথা কমু দাদাবাবু? কথাখান কয়দিন ধইরাই মনের ভেতর হ্যাঁচোরপ্যাঁচোর করে, কিন্তু শুধাইতে গেলে ক্যামোন য্যানি বন্দ হইয়া আসে মুখ। মন কয়, তুমি শ্যাষে বিরক্ত হবা না তো?"

"আরে না না! তোমার উপর বিরক্ত হব কেন? বলো কী কথা।"

"অসুখের পর থিক্কাই তোমারে ক্যামোন জানি বেচাল বেচাল দেখি। হাইস্‌সা কথা পর্যন্ত কও না। এ-ঘর ও-ঘর কইরা কী য্যানো একখান খোঁজো, অগোছালো কইরা রাখো সব। আবার একা একাই কথা কও। কী হইছে তোমার?"

"তাই বুঝি? ধ্যা-ত! ও কিছু না।"

"কিছু একখান তো আছেই। সে নাহয় আমারে না কইলা, কিন্তু ঠিকমতো

যে খাওদাও না, শরীলটার যত্নআত্তিও করো না, চুলদাড়ি ছাটো না, বইস্‌সা বইস্‌সা একটার পর একটা বিড়ি খাও, সেইসব দেইখ্‌খা বড়ো ডর লাগে মনে।”

পতিত চুপ করে থাকে। দীপালিদিও আর কিছু না বলে রান্নাঘরে চলে যায়। জলখাবার খেতে খেতে পতিত ঠিক করে দীপালিদিকে ছুটি করে দেবে আজ থেকে। মনে মনে ভাবে, ওর সামনে পাবনের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে গেলে সেটা গোলযোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আপনমনেই ঠিক করে, দিনের বেলা হোটেলে নিরামিষ খেয়ে নেবে, আর রাতে নিতাইদার দোকান থেকে রুটি কিনে এনে কোনোদিন ডিম, কোনোদিন মাংস, কোনোদিন-বা একটা তরকারি বানিয়ে নিলেই হবে। ধীর পায়ে তখন সে রান্নাঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়: “তোমাকে একটা কথা বলার ছিল দীপালিদি।”

থালা দিয়ে কড়াইয়ে চাপানো রান্না ঢাকা দিতে দিতে ঘাড় ফেরায় দীপালিদি: “কী কথা?”

“ভাবছি, কোথাও একটা বেড়িয়ে আসব। মাস খানেকের জন্য।” বানিয়ে বানিয়েই বলে পতিত। সরাসরি ওকে নিষেধ করে দিতে কেমন সংকোচ হয়।

“বাড়ি পাহারা তো? আইচ্ছা, মনোজরে কয়্যা দিমু আমি। ও আইয়া রাত্তিরে শোবেখন।”

“না না। এ-বাড়িতে আর কীই-বা আছে? পাহারার তেমন দরকার দেখি না। বরং তুমি আজই এ-মাসের আর আগাম মাসের পুরো টাকাটা নিয়ে যেয়ো। ভাবছি কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ব।”

“কাইলই? কই আগে তো কও নাই?”

“যাবার স্থির ছিল না, তাই বলিনি। অনেকদিন তো বেড়াতে যাইনি কোথাও, কাল রাত্তিরে মনে হলো, নাঃ, এবার বেরিয়ে পড়তেই হবে। একঘেয়ে হয়ে গেছে সব কিছু।”

“যাবা কই, দাদাবাবু?”

“হিমালয়।”

“সন্নিসি হবা নাকি শেষমেশ?”

“নতুন করে আমি আর কী সন্ন্যাসী হব? তবে হ্যাঁ, সন্ন্যাসী একজন আছেন। সেদিন হঠাৎ আলাপ। তারপর থেকে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়। ধীরে

ধীরে ওঁর সঙ্গে খুব জমে গেছে ভাব। আজকাল তো সে আবার আমার সাথে খুব মশকরাও করে। বলে, সন্ন্যাসগিরিটা নাকি মস্ত কাজ। বলে, আমাকে সে তার আখড়ায় নিয়ে যাবে। ভাবলাম, যাই, গিয়ে দেখি সেই সন্ন্যাসী কী অত কাজ করে বেড়ায়!” দীপালিদির মনটাকে হালকা করে দিতেই পতিত হেঁয়ালি করে করে এত কথা বানায়।

“সে-সন্নিসির কথা তোমার মুখে তো কখনো শুনি নাই। তারে জুটালে কৈথিকা শুনি?”

“আমি জুটিয়েছি নাকি! নিজেই এসে জুটেছে।”

“মানুষডা ক্যামোন? ঠগ-জোচ্চোর নয় তো?”

“সে জানি না, তবে জেনে যাব। সেইজন্যই তো যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে।”

“ঠিকাছে। অ্যাখুন একবার বাজারে যাও দিখিনি। একটু খাসির মাংস কিইন্যা আনো। আবার কবে তোমারে রাইন্ধা খাওয়াবার পারুম, কে জানে! সন্নিসির লগে যাইবার আগে একটু ভালো কইরা খাওয়াই তোমারে।”

“বেশ তো।” বলে, পতিত ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ে বাজারের দিকে। যেতে যেতে ভাবে, এতগুলো মিথ্যে কথা তো বলল দীপালিদিকে, ধরা পড়লে কী অজুহাত দেবে সে তখন?

বাজারে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। পুলিশের জিপ। কাতারে কাতারে মানুষ। লোকমুখেই পতিতের শোনা হয়ে যায় ঘটনার অনুপুঙ্খ ও তারও অধিক আরও কত কিছু। অনেক অনুমান, অনেক অনেক রহস্যকাহিনি আর কাহিনির নানা উত্থান-পতন।

আজ ভোরে বাজারের কাছের বড়ো পুকুরের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেছে দুই অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহ— একজন যুবক, অন্যজন সম্ভবত কোনো বিবাহিত যুবতী (সম্ভবত বিবাহিত কেননা কেউ কেউ নাকি ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ দেখেছে)। যুবক মুসলমান, যুবতী হিন্দু (যুবকের মুসলিম পরিচয়কেও অনুমানই বলতে হবে, কেননা লাশ দুটোর এখনও শনাক্তকরণ বা পোস্টমর্টেম কিছুই হয়নি)। দু-জনেরই শরীর গুরুতর জখম। মুখ প্রায় থেঁতলে গিয়েছে (থেঁতলানো মুখমণ্ডলে সিঁদুরের দাগ চিহ্নিত করা কি সম্ভব?)। জনতা দুই ভাগ— হত্যা না আত্মহত্যা— এই বিতর্ক নিয়ে। তবে সকলেই নিঃসন্দেহ যে, এটা প্রেমঘটিত ব্যাপার। অনেকে অবশ্য এও মনে করছে, বিবাহোত্তর পরকীয়াই এই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ। চারদিকে

প্রেসের লোকজন খবর সংগ্রহে ব্যস্ত। ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, টিভি চ্যানেলের ওবি ভ্যান ইত্যাদি। অতএব, আজ সারাদিনে অন্য কোনো আরও চাঞ্চল্য-জাগানো খবর শিরোনামযোগ্য হয়ে না উঠলে চ্যানেলে চ্যানেলে এই খবরেরই এক্সক্লুসিভ ঘণ্টায় ঘণ্টায় সম্প্রচারিত হতে থাকবে। কাল খবরের কাগজ জুড়েও দেখা যাবে সেসব ফলাও হয়ে ছেপে বেরিয়েছে। ক-দিন মানুষজন পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে, বাড়ির ড্রয়িংরুমে এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে নানান গল্পকথায় আর কূটকচালে। তারপর আর-পাঁচটা খুনের ঘটনার মতো কোনো কিনারা ছাড়াই মৃত্যু ঘটবে এই 'রোমহর্ষক' হত্যারহস্যের (অবশ্য সন্দেহ নেই যে, যতদিন জনগণ গিলবে এই খবর, ততদিন এ-ঘটনা ক্রাইম থ্রিলার হিসেবে প্রচার পেতেই থাকবে)। সামান্য সূত্র পেলে অবশ্য ব্যাপারটা পোলিটিক্যালও হয়ে উঠতে পারে। তখন আলোচনাটা আরও বেশি সময় ধরে জিয়ে থাকবে। সবশেষে এও নিশ্চিত যে, একদিন জনতা ওই যুবক-যুবতীকে পুলিশেরই মতো মর্গে পাঠিয়ে পোস্টমর্টেম-অন্তে উপযুক্ত কারণের অভাবে ফাইলচাপা দিয়ে অন্য কোনো খবরে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পতিতই-বা তার ব্যতিক্রমী হবে কেন? বরং সে আরও দ্রুত বিশ্রুত হতে চেয়ে একটা সিগারেট কিনে সুখটান দিতে দিতে নিবিষ্ট মনে পরিচিত দোকান থেকে খাসির রানের পছন্দসই মাংস কিনে বাড়ি ফিরবে। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে দীপালিদি। হয়তো ততক্ষণে ওর কানেও খবরটা পৌঁছে গুজবের অন্য-এক কিসসা বেশ মশলাদার হয়ে উঠবে, এবং তারপর, ওর হাতের জাদুতে কষা মাংসের ফোড়নে গোটা বাড়ি জুড়ে গন্ধের মৌতাত ছড়িয়ে পড়বে। তারও পরে রাত্তিরে পাবনের সঙ্গে বসে সেই মাংসের স্বাদ নিতে নিতে হয়তো সে-ছোঁড়া কাহিনির পুঙ্খানুপুঙ্খ কাঁটাছেঁড়ায় একটু বেশি মাত্রায় সিরিয়াস হতে চাইবে। আর তখন, পতিতের মনে পড়ে যাবে ডায়রির কথা। পাবনকে সে মৃদু তিরস্কারে সতর্ক করতে উদ্যত হয়ে উঠবে।

অথচ সত্যি সত্যিই যখন রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে পাবন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করল, পতিত বেমালুম ভুলেই গেল ডায়রির বিষয়টা উত্থাপন করতে।

পাবন বলল, "ঘটনাটা কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত ও রাজনৈতিক। সেটা হত্যাই হোক বা আত্মহত্যা।"

"কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার?" পতিত জানতে চাইল।

"কারণ, লোকের কথামতো যদি সত্যিই ছেলেটি গরিব মুসলমান আর মেয়েটি অবস্থাপন্ন বর্ণহিন্দু হয়ে থাকে।"

"তাতে কী।"

"অর্থাৎ সমাজের চোখে সম্পর্কটা অবৈধ।"

"বাজে কথা। আজকাল প্রায়ই এমন সম্পর্কের কথা শোনা যায়।"

"শোনা যায়, কিন্তু পরিণতি পায় ক-টা?"

"তুমি কী করে এত জানলে ওদের সম্পর্কে? ওরা কি পরস্পর বিবাহিত?"

"সে আমি জানি না ঠিকই। এমনকী, তুমি যা জান তার থেকে বেশি কিছু জানি, সে-দাবিও করব না। তবু মনে হয় সম্পর্কটাকে অবৈধ প্রতিপন্ন করে তোলাতেই সকলের আগ্রহ।"

"তুমি কি গিয়েছিলে ওখানে?"

"না গেলেও লোকমুখের কথা থেকেই আন্দাজ করা যায় তা।" মাংসের হাড় চিবুতে চিবুতে পাবন বলল।

"তবু, বিশেষজ্ঞের মতো তাকে পূর্বপরিকল্পিত, রাজনৈতিক— এইসব তকমা লাগাতে পারতাম না আমি।" রুটির টুকরোতে মাংসের ঝোল ভালো করে লাগিয়ে মুখের ভিতর টেনে নিয়ে পতিত পাবনকে যেন খানিক তুচ্ছ করেই কথাগুলো কেটে কেটে উচ্চারণ করল।

"তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে আমি তো কথাটা পাড়তামই না।" শেষ গ্রাস মুখে পুরে পাবন সহজ ভঙ্গিমাতেই বলল। ওর কথা বলার ঢঙে কোথাও এতটুকু শ্লেষ ছিল না, যদিও কথাগুলো যথেষ্টই শ্লেষাত্মক বলে মনে হলো পতিতের। ছেলেটার জ্যাঠামোয় যথেষ্ট বিরক্ত হয়েও তাই তক্ষুনি তক্ষুনি ভেবে পেল না কী প্রত্যুত্তর দেবে। কিছুটা সময় নিয়ে, মাংসের মেটুলির অন্তিম স্বাদ নিতে নিতে অবশেষে নাছোড় ভঙ্গিতে যেন, কিছুটা উপহাসছলে বলে উঠল, "বেশ। ক-দিনেই তো তদন্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিছু কিছু। তখন তোমার ধারণা ঠিক কি না প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"দেখো পতিতদা, তদন্তে কী হলো বা সংবাদপত্র কী লিখল তা নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই আমার। আমি তোমার কাছে কিছু প্রমাণ যেমন দিতে চাই না তেমনই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করব ভেবে এত কথাকে বানিয়ে বানিয়ে বলিনি। ঘটনাটা হয়তো আমাকে ভিতর ভিতর বেশিই আলোড়িত করে তুলেছে। তবু আমি এখন যেমন নিশ্চয় করে বলছি পূর্বপরিকল্পিত ও

পোলিটিক্যাল, তদন্তে যাই হোক-না-কেন, পরেও একই বলব। কারণ সময় বাধ্য করছে আমাকে—"

"সময়!" বিস্ময় গোপন করতে পারে না পতিত।

"হ্যাঁ, সময়। যা আমাদের বাস্তবতা শেখায়। ঘাড়ে ধরে বলে, হয় বুঝে নাও, নয় বাতিল হয়ে যাও।"

বাতিল শব্দটা পতিতের মাথার ভিতর, শরীরের শিরা-উপশিরায় রীতিমতো তোলপাড় হয়ে উঠল। মেনে আর মানিয়ে নেওয়া কি তবে বৈজ্ঞানিক সত্য? সারভাইভাল-এর শর্ত?

মনে পড়ে গেল আজই দীপালিদিকে আসতে নিষেধ করার কথাটা। বাসন ধুতে ধুতে সে পাবনের উদ্দেশে বলল, "আমি দীপালিদিকে, মানে আমাদের রান্নার দিদিকে আজ থেকে কাজে আসতে বারণ করে দিয়েছি।"

"জানি।" পাবন বলল।

"জান? আশ্চর্য! কথাটা কে বলেছে তোমাকে? দীপালিদি? তুমি তাকে জান?" পতিত অবাক।

"জানব না? এতদিন রয়েছি এখানে। সকালে উনি যখন কাজে আসেন বেশিরভাগ দিনই তুমি তো ঘুমিয়ে থাক। আমিই দরজা খুলে দিই। তারপর জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি কাজে। আজ বাড়ি ফিরছি যখন, রাস্তায় দেখা। খুব বিমর্ষ লাগছিল ওঁকে। চিন্তিতও। উনি বললেন, তুমি নাকি কোন্-এক সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরুচ্ছ কাল।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তুমি।"

"তা, সেই সন্ন্যাসীটি কে? আমি নয় তো?" বলে সামান্য উচ্চস্বরে হেসে উঠল পাবন। সেই হাসির মাঝে কোথা থেকে একটা উচ্চিংড়ে উড়ে এসে পতিতের জামার মধ্যে ঢুকে একটা অস্বস্তি বাধিয়ে তুলল।

"তুমি হতে যাবে কোন্ দুঃখে? সে আছে একজন। কিন্তু তোমাকেও যে এ-ক'দিন অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে পাবন।" পতিত জামার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে কষ্টেসৃষ্টে অনুপ্রবেশকারী পোকাটাকে মুঠোয় ধরে ঘরের জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরের ঝিঁঝি অন্ধকারে।

"তোমার আসল মতলবটা কী বল তো? বেড়াতে যাবে তো যাও, কিন্তু আমাকে তাড়াও কেন, এত্ত বড়ো বাড়ি, জমিও নেহাত কম নয়। যা দিনকাল! ধরো, বেড়াতে গিয়ে কোনো অঘটনই যদি ঘটে যায় তোমার, তখন সমস্ত

বেদখল হয়ে যাবে না? তোমার তো নিজের কেউ নেই, হয়তো জমি-বাড়ির দখলদারি নিয়ে লেগে যাবে ধুন্ধুমার। সরকারি পার্টি, বিরোধী পার্টি, হাতকাটা ফণি, ল্যাংড়া দিলীপ, কেলে পঞ্চা, জাভেদ মস্তানদের মধ্যে। ভেবে দেখেছ পরিবারের মানসম্মানের কী হবে? ভাববে না একটিবার, ঠাকুমা-বাবা-মায়ের কত শ্রম কত ক্লেশ কত ত্যাগ মিশে আছে এই বসতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আনাচে কানাচে?"

"আঃ, এর মধ্যে পরিবারের মানসম্মানের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে শুনি?"

"আসে না? ওঁদের এত ভালোবাসার এই বাড়ি কি শেষমেশ ধুলোয় মিশে গিয়ে ওইসব স্বার্থপর, গুন্ডা-বদমাশ, অসৎ লোকগুলোর হাতে পড়ে ফ্ল্যাট-কলোনি তৈরি হবে? আমার তো মনে হয় তোমার এখনই এই জমি-বাড়ির ব্যাপারে একটা ভাবনাচিন্তা করা দরকার।"

এতক্ষণ ধরে পাবনের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলেও শেষের কথাগুলোয় পতিতের মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, তাই তো! পাবনও-যে তেমন কোনো উদ্দেশ্যে এ-বাড়িতে ধীরে ধীরে গেঁড়ে বসতে চাইছে না, তারই-বা নিশ্চয়তা কী? সন্দেহ বস্তুটাই এমন যে, তা আরও আরও সন্দেহের জাল বিস্তার করে রীতিমতো ফাঁসের মতো দৃঢ় হয়ে চেপে বসে: ডায়রির পাতায় ছেলেটার হাতের লেখা দেখে পতিতের নিজের হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু না হলেও বেশ ভালোরকম মিলের ব্যাপারটা সে কাকতালীয়ই ভেবেছিল, কিন্তু এখন তা একটু যেন ঘাবড়িয়েই তুলল তাকে। নাঃ, ছেলেটাকে আরও বাজিয়ে দেখা দরকার। ভাবল পতিত। পাবনের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, "ঠিক। ঠিকই বলেছ তুমি। জমি-বাড়ির ব্যবস্থা না করে কোথাও যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"গুড। তাহলে দীপালিদিকেও আর আসতে বারণ করার কোনো মানে হয় না। তাই না?"

পাবন এমনভাবে বলল যেন ও-ই এ-বাড়ির মালিক। পতিতের একবার মনে হলো দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই পারল না তা। ছেলেটার সঙ্গে ক্রমশ যেন তার জীবন জড়িয়ে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন করে নেবার শক্তি পাচ্ছে না কোনো। কথা না বাড়িয়ে ধোয়া বাসন গুছিয়ে রাখার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখেই ধীর পায়ে সে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে তার বর্তমান শোবার ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল।

ঘুম ভাঙতেই পতিত দেখল ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। চোখ কচলে ঠাহর করতে চাইল কোন্ স্টেশন। সামনের যাত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বুঝতে পারল নতুন প্যাসেঞ্জার। কাল ট্রেনে উঠে যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, ইনি তিনি নন।

"কোথায় যাবেন আপনি?" নতুন যাত্রী সপ্রশ্ন চাইলেন।

"বেনারস।" পতিত সিটে আধশোয়া বসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল।

"করেছেন কী! এটাই তো বারাণসী। দু-এক মিনিটের ভিতরই ট্রেন ছেড়ে দেবে। শিগগির নেমে পড়ুন মশাই।"

ভদ্রলোকের কথায় পতিত মুহূর্ত আগের ঢিলেঢালা ভাবটুকু নিমেষে দূরে ঠেলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে লাফিয়ে নামল আপার স্লিপারের থেকে। পায়ে জুতো গলিয়ে তড়িঘড়ি নীচের সিটের তলা থেকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা ব্যাগটাকে বের করতে গিয়ে দেখল সেটা নেই।

"কী হলো মশাই?" ভদ্রলোক যেন পতিতের থেকেও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

"আমার ব্যাগ?" কাতর চিৎকার বেরিয়ে এল পতিতের গলা থেকে।

"নেই?"

"নাঃ!" পতিত দেখল ইতিমধ্যে আশপাশের অন্য যাত্রীরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

"যা দিনকাল পড়েছে, ওরকম পড়ে পড়ে ঘুমুলে যা হবার তা-ই হয়েছে।" নতুন যাত্রীটির বলার ঢঙে সামান্য কি বিরক্তির প্রকাশ? না কি তাচ্ছিল্যের?

"কী কী ছিল দাদা ব্যাগে? খুব দামি কিছু?" ভিড়ের থেকে এক মাঝবয়সি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

"এখন এইসব কথাবার্তার সময় নেই আর। ট্রেন ছেড়ে দিলে বিড়ম্বনা বাড়বে বই কমবে না। বরং তাড়াতাড়ি নেমে রেলপুলিশের কাছে গিয়ে এফ.আই.আর. করুন। সুরাহা যদি পেতে হয় কিছু, ওছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।" নতুন যাত্রী-ভদ্রলোক খুব আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিতে

চাইলেন।

ভদ্রলোকের পরামর্শ শিরোধার্য করে পতিত কামরা থেকে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে, আর ট্রেনটাও প্রায় তক্ষুনি তক্ষুনি ছেড়ে দিল।

ব্যাগে জামাকাপড় ছাড়াও ছিল ফেরার রিজার্ভেশন টিকিট, সামান্য খুচরো পয়সাকড়ি, আর একটা ব্যক্তিগত ডায়রি। ছোটোবেলা থেকেই কোথাও বেড়াতে গেলে সে এই ডায়রিটা সঙ্গে নিতে কক্ষনো ভোলে না। বাবার কাছে শেখা। সেই যেবার সবাই মিলে পুরী যাওয়া হয়েছিল, বাবা ওটা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "নে, এটাকেও ব্যাগে পুরে নে। বেড়ানোর দিনগুলোতে রোজ রাতে কিছু-না-কিছু লিখে রাখবি। সেসব লেখা একদিন দেখবি তোর কাছেই অচেনা হয়ে উঠবে। আবার অনেক কাঁচা লেখা পড়ে হয়তো বিরক্তিকর মনে হবে, হাসিও পাবে। তবু দেখবি সময়ের একটা জলছবি যেন সেঁটে থাকবে ওইসব লেখার মধ্যে, ইতিহাসের টুকরো অংশ।"

খোয়া-যাওয়া কোনোটার জন্যই তেমন আক্ষেপ হচ্ছিল না, কিন্তু সালতামামি জুড়ে থাকা টুকরো টুকরো লেখাগুলোর কথা ভেবে ডায়রিটার জন্য ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল পতিতের। তার মতো মানুষের জীবনকথাও কি ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে— এমন একটা সংশয় প্রায়ই তাড়িয়ে বেড়াত পতিতকে। ডায়রিটা হারানোর ফলে আজ সেই সংশয়টুকু যেন হঠাৎ সরে গেল মনের থেকে।

যদিও শেষ কবে ডায়রির পাতাগুলোকে উলটেপালটে দেখেছিল সে-কথা স্মরণে আনতে পারে না পতিত, তবু লেখাগুলোর উপর বড়ো মায়া ছিল; সেই মায়ার টানেই হয়তো-বা এখন সেসবের স্পর্শ ও স্বাদ পেতে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠল সে। কখনো কোনো অবসরে হঠাৎ করে সেইসব ভ্রমণবৃত্তান্তের নির্বাচিত অংশ পড়ে ফেলার যে-ইচ্ছেটুকু কৃপণের মতো জমিয়ে রেখে আনন্দ পেত, এই মুহূর্তে সেই আনন্দটুকু উবে গিয়ে গভীর বিষাদ নেমে এল মনে। কাতর অবসাদে ভারাক্রান্ত পতিত প্ল্যাটফর্মের একটি বেঞ্চে ঠায় বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেখান থেকে উঠে ডায়রিটা ফিরে পাবার দুরু দুরু আশা নিয়ে রেলপুলিশের দপ্তরে গিয়ে এফ.আই.আর. করল। বার বার কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে অনুরোধ জানাল, অন্য কিছু না, শুধু ওই ডায়রি ফেরত পেলেই খুশি হবে সে। কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশকর্মীটিকে যথেষ্ট নির্লিপ্তই মনে হলো। বরং তাকে জিজ্ঞাসা করে করে দামি কী কী খোয়া

গেছে সেই লিস্ট বানানোতেই বেশি আগ্রহ ওর। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে সহযাত্রীদের পোশাকআশাক, মুখের আদল, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনিয়ে যখন রেলপুলিশের আপিস থেকে বেরিয়ে এল পতিত, ডায়রি খোয়ানোর কষ্টের তুলনায় অনেক অনেক বেশি বিধ্বস্ত দেখাল তাকে। মনে হলো, একটু ঘুমুতে পারলে বেশ হতো। স্টেশন থেকে বেরিয়ে গঙ্গাপাড়ের সস্তা একটা আশ্রমে থাকা-খাওয়া বাবদ ভাড়া ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। ভাগ্যিস টাকাকড়ি তেমন ছিল না ব্যাগে, সবই সে রেখে দিয়েছিল প্যান্টের ইনার পকেটে। মনে মনে খুশি হবার মতো এইটুকু সান্ত্বনা পেয়ে কাজ চালানোর মতো দু-একটা জামাকাপড়, একটা গামছা, সাবান-টুথপেস্ট-ব্রাশ কেনার পরে এমনকী একটা খাতা আর পেনও কিনে ফেলল সে। হ্যাঁ, লিখতে তো তাকে হবেই। মুদ্রাদোষের মতো অভ্যেস ত্যাগ করাটাও সহজ নয় মোটে।

"আরে! পতিতদা না?" পতিত চোখ তুলে দেখল বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক মহিলা সরাসরি তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করেছে। অবাক হলো। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে মেয়েটিকে কোনোভাবেই তবু মনে আনতে পারল না।

"চিনতে পারছ না, তাই তো?" মেয়েটি হেসে উঠল। "সময় দিচ্ছি, মনে করতে পার কি না দেখি!"

পতিত নিরুত্তর। ফের স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল। কিন্তু হতাশই হলো সে। কোনোক্রমেই মনে করতে পারল না কে এই মহিলা।

"আমি তোমাদের সেই তমালী। পলাশের বোন।"

পলাশের বোন তমালী! ছোট্টবেলার সেই ফ্রক-পরা অনর্গল বাঙাল-ভাষায় বকবক-করা মেয়েটা? কই, এখন তো মুখের ভাষাই বদলে গেছে, দিব্যি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ।

"তুই! আমাকে চিনতে পারলি? মনে আছে!" পতিতের প্রশ্ন করার ঢঙেই বিস্ময়ভাবের উপস্থিতি স্পষ্ট প্রকাশিত।

"এক ঝটকায় যে চিনেছি, বলব না। তবে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করতে করতে নিশ্চিন্ত হলাম, ঠিকই চিনেছি। চলনবলন, চোখমুখের হাবভাবের ধরন ঠিক পতিতদারই মতো!" মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল তমালী।

"এখানে বেড়াতে এসেছিস বুঝি?"

"না। এখানেই থাকি এখন আমি। তুমি নিশ্চই বেড়াতে এসেছ। চলো, আমার বাসায় চলো। সেখানে বসে সব কথা হবে।"

"কিন্তু আমার যে স্নান-খাওয়া কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণ আগেই গঙ্গাপাড়ের আদ্যা-মার আশ্রমে এসে উঠেছি। বিকেলে তুই বরং চলে আয় সেখানে। তারপর তোর সঙ্গে বেরিয়ে তোদের বাড়ি যাব।"

"স্নান-খাওয়া আমার ওখানেই করবে। অ্যাদ্দিন পরে একজন আপনার লোককে পেয়েছি। কাছছাড়া করতে পারব না।"

তমালীর নাছোড় মনোভাবে অগত্যা পতিতকে রাজিই হতে হলো। তারপর স্নান-খাওয়া সেরে দুপুরের বিশ্রাম নিতে নিতে এ-কথা সে-কথায় কত কী-ই জানা হয়ে গেল তার। সেইসব জেনে-ফেলা যে খুব আবশ্যক ছিল, কিংবা সেসব জানার মধ্য দিয়ে কোনো অজানা রহস্যের সন্ধান পেয়েছিল, তা নয়, তবু পতিতের মনে হয়েছিল, মানুষের কথার ভিতরে যে-অসংখ্য না-কথারা লুকিয়েচুরিয়ে ঘাপটি মেরে স্মৃতি হয়ে বসে থাকে, যেন বাষ্পের আবরণে ঘন হয়ে-থাকা বাতাসের বুদবুদ, সামান্য চাপ ও তাপের তারতম্যে হঠাৎ করে ফেটে গিয়ে উন্মুক্ত করে ফেলে নিজেকে, ঠিক তেমন করেই সেসব স্মরণাতীত মুহূর্তরা ধীরে ধীরে বহুমাত্রায় মুক্ত হতে পারার আনন্দে, এক অচেনা অনন্য জীবনের যাত্রায় পাড়ি দেবার অবকাশ পেয়ে, কিংবা হয়তো স্বপ্ন, হয়তো-বা মায়া, অথবা আতিশয্যের আবেগঘন অজানা কোনো অভিযানের রোমাঞ্চে তাদের দু-জনকেই আমোদিত করে তুলেছিল। শুধু কি আমোদ? না কি আক্ষেপ কোনো? স্মৃতির ঘনিমা থেকে ক্রোধ, ঈর্ষা, লালসার মতো প্রতিহিংসাপ্রবণতাও কি জাগ্রত হয়ে উঠতে চায় না? জীবনকে পতিত প্রতিদিন কতটুকু ভালোবেসে আর কতদূর ঘৃণা-রিরংসায়, মনুষ্য আর মনুষ্যেতরে গিয়ে বেঁচে চলেছে? এ কি শুধু তারই বিভ্রম, না কি সব মানুষের, মনুষ্যপ্রজাতিরই, অক্ষমতা?

তমালীর কথা শোনে আর ভেবে চলে তার অন্তঃস্থ কথার কাহিনিকেও। এ এক অদ্ভুত মায়াজগৎ, যেখানে কুশীলব হয়ে উঠতে চাইলেও, অভিনয় সম্পন্ন হতে পারে না। যেন সকলেই চরিত্র-সন্ধানে রত। নিজের নিজের যথোচিত ভূমিকা অবহেলিতই থেকে যায় অতএব।

তমালী বলছিল, কীভাবে দাদার মৃত্যুর পর ওর মার পক্ষে অসহ হয়ে

উঠেছিল কমলপুরের বসবাস। বাবার চলে যাওয়াও মাকে সেভাবে বিচলিত করেনি, যতটা করেছিল পলাশের ওইভাবে আত্মহননকে বেছে নেওয়ায়।

"আচ্ছা পতিতদা, জবাদির কথা কিছু জান? কেমন আছে সে?"

"নাঃ।" পতিতের নেতিকরণের মধ্য দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসও যেন ঝরে পড়ে। পলাশ ঠিক বন্ধু না হয়েও তার কাছে এমন একজন কেউ ছিল, যার কথা ভুলতে পারে না কিছুতে। কী এক টান আজও ওর কথা শুনতে আর ভাবতে প্রাণিত করে তোলে পতিতকে।

"কিন্তু দাদা কেন জবাদিকে ভালোবেসেছিল? জবাদি তো ফিরেও তাকাত না। সে কি জবাদির বিস্ফোরক রূপের মোহেই?"

"কে জানে! জবার রূপ ছিল ঠিকই, কিন্তু বিস্ফোরক, এমন তো মনে হয়নি কখনো।" কথাটা পতিতের মুখ থেকে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারিত হলো।

"তোমার কথা আলাদা। কিন্তু দাদা? তার কথা তুমিও জান না? দাদা তো তোমাকে খুব মানত। মাকে প্রায়ই বলত, পতিতকে আমার ঠিক বন্ধু না, কেমন যেন বড়ো দাদার মতো লাগে। সেসময় দাদার সেই কথার ভার বুঝে উঠতে পারিনি। আজও যে খুব পারি, তা নয়, তবু বহুদিন মনে হয়েছে, তুমিও কি বুঝতে পারনি নিজেকে হত্যা করার মতো অমন একটা কাজ হঠাৎ সে করতে গেল কেন?"

"আমি আজও তোরই মতো সে-উত্তর খুঁজে চলেছি রে তমালী। কোনো সূত্র কি সত্যিই সে আমাদের জন্য ছেড়ে গিয়েছিল? মনে পড়ে, একবার বলেছিল শুধু, বেঁচে থাকতে জবাকে সে কারও হতে দেবে না। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার মানে যে দাঁড়াবে নিজেকেই শেষ করে দেয়া সেটা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি।"

"তবে?"

"এখন বুঝতে পারি ভালোবাসা এমনভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে চায় সব কিছু, অধিকার করে নিতে চায় সব।"

"তবু ভালোবাসাই সব হয়ে ওঠে না।" কথাটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল। তমালীই কি বলল, না কি আপনিই ঘরের আসবাব থেকে, দেয়ালের জড়কাঠিন্য থেকে গুমরে উঠল? অতলান্ত থেকে, চারপাশের ক্রমাগত চাপের প্রবণতা থেকে মুক্তি পেয়ে বুদবুদ যেমন ভেসে ওঠে জলের উপরিতলে,

আর, এক আকাশ বাতাসের সন্ধান পেয়ে সহসা ফেটে গিয়ে মিশে যায় উষ্ণ বায়ুমণ্ডলের ভিতর, তেমনই কি কথাটা আপনিই তৈরি হয়ে দীর্ঘশ্বাসের মতো চাপা অনুরণন তুলে আপনিই মিশে গেল ঘরের চারপাশে?

কিছুটা নীরব অবকাশের পর, সদ্য ফোটা ফুলের মতো স্তবকের গভীর থেকে চারপাশের রোদ্দুরের আনন্দ নিতে পাপড়িরা যেমন নিজেদের মেলে ধরে, এতদিনের অনুচ্চারিত কথারাও তেমন করে প্রগল্‌ভ মুক্তির টানে অথবা সময়ের অবকাশে নিজেদের চিনে নিতে নিতে, একটু একটু করে ওদের কথোপকথনের সুড়ঙ্গ ধরে বেরিয়ে আসতে থাকে ফাটল-ধরা পাথরের গা বেয়ে। কখনো নিজের নিজের মনের ভিতর চিন্তার স্রোত হয়ে, কখনো আবার পরস্পরের কথা-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ অভ্যাসের ঢংটিকে দস্তুরমতো বিজ্ঞাপিত করে।

ক্রমশ জানল পতিত, কমলপুর ছাড়ার পর মাসিমার এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের বাড়িতে এসে উঠেছিল তমালীরা। তারপর বারো ক্লাসের পড়া শেষ হতেই বিয়ে। কিন্তু সে-বিয়ে সুখের হলো না। স্বামীর ছিল ড্রাগের নেশা। একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বেঘোরে জলে ডুবে মারা গেল সে, আর তমালীও পালাল শ্বশুরবাড়ি থেকে। সোজা কলকাতায়। তারপর ঘটনাচক্রে ফিরে আসা বারাণসীতেই। এক বৃদ্ধার দেখ্‌ভালের কাজ নিয়ে। সেই বৃদ্ধা মাসিমার উৎসাহে তমালীর আবার পড়াশুনার শুরু। ভালোভাবে পাশও করে যায় গ্রাজুয়েশন। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কেরানির চাকরিও যায় জুটে। তারপর বছর চারেক হতে চলল সেই মাসিমা তাঁর মৃত্যুর ক-দিন আগে এই বাড়িটা তমালীর নামে লিখে দানপত্র করে দিয়ে যান।

"চাকরি করিস যখন, নতুন করে সংসার করতে পারতিস তো... এতটা জীবন পড়ে আছে..." পতিত বলল।

কথাটায় খিলখিলিয়ে উঠল তমালী। "তার আর দরকার হলো না পতিতদা। লম্পট স্বামীর কারণে যে-বাচ্চাটা এসেছিল পেটে, সেটা জন্মাবার আগেই মাংসপিণ্ড হয়ে বেরিয়ে এল। ডাক্তার বলেছিল, ইউটেরাস বাদ না দিলে আমাকে বাঁচানো যেত না। সেই সন্তানকে হারানোর পরই তো পালালাম আমি।"

"জবাও পালিয়েছিল। কিন্তু কেন? সেও কি হারিয়ে ফেলেছিল কিছু? হারানোর দুঃখ কি আমাদের পালাবার ইচ্ছেটাকে চাগিয়ে দেয়?"

"কে জানে! হয়তো লোভ। মুক্তির স্বাদ। আমি যে পালিয়েছিলাম, সে তো নিজের মতো করে বাঁচব, এই লোভেই।"

"লোভ না বাসনা, না কি নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল জবা? মাস্টারমশাইয়ের কঠোর শাসনের থেকে?"

"আমি তখন বেশ ছোটো। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কমসম ধারণা থাকলেও লোভ-বাসনা কী বুঝতাম না অত। পাড়ার মেয়ে-বউদের বলাবলি করতে শুনেছি, প্রেম-ট্রেম কিচ্ছু না, স্রেফ নাকি শরীরের টান। কিন্তু এ-কথা নিশ্চই বলব, পালানোর হিম্মত ছিল জবাদির। নিজে পালাতে গিয়ে টের পেয়েছি, হিম্মত না থাকলে সব ছেড়েছুড়ে ঘরছুট হওয়া যায় না।"

"হবে। হয়তো ঠিকই বলছিস তুই। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানিস, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে পালিয়ে নিজের দিকে ফিরতে চাই, আর, সেই পালাতে গিয়েই ফের সকলকে জড়িয়ে নিই পালানোর বৃত্তে। তা যদি না হতো তবে তো পালাবার ঠিক পরে পরেই জীবন বলে কিছু থাকত না। মৃত্যুই শুধু পারে চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ করে নিজের দিকে ফেরাতে।"

"ঠিক বুঝলাম না। তোমাকে নিয়ে এই হলো বিপত্তি, হঠাৎ কেমন দুর্বোধ্য হয়ে যাও।"

পতিত মুচকি হাসল। কোনো জবাব দিল না।

"তুমিও কি পালিয়ে এসেছ পতিতদা? বাড়ির লোকে তো তাহলে এখন খুব ভাবছে তোমাকে নিয়ে!" তমালী বলল।

"পালানো বলতে পারিস, আবার না-পালানোও।" ঠোটের কোণে মুচকি হাসিটাকে অক্ষত রেখেই বলে চলল পতিত: "বাড়ির কথা বলছিস? এখন আর তেমন কেউ নেই যে অপেক্ষা বা দুশ্চিন্তা করবে আমার জন্য।"

"মাসিমা বেঁচে নেই? বিয়ে করনি তুমি?"

"তোর দুটো প্রশ্নেরই উত্তর— না। মা বেঁচে থাকতে চাকরি পেয়েও নানা কারণে তা করা হলো না। আর বিয়ে? সত্যি বলতে কী, বিয়ে করার কথা কোনোদিন মনেই হয়নি। মা-ও তা নিয়ে কখনো চাপাচাপি করেননি। এমনভাবেই দেখি দিব্যি কেটে যাচ্ছে দিন-মাস-বছর। একবার এই একলা জীবন অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে-অভ্যেস ত্যাগ করা বড়ো কঠিন। নে, এখন অন্য কথা বল শুনি। আমার কথায় তেমন আর নতুনত্ব নেই কিছু।"

"ইশ্! তুমি যেন কেমন। দাদা দেখছি যথার্থই বলত, 'পতা সাদাসিধা

ঠিকই, কিন্তু ওর লগে একসাথে চলতে ডর লাগে'।" তমালী হেসে উঠে তারপর হাসিকে চেপে বলে চলল, "দাদার কাছে তোমার কথা শুনে শুনে ছোটোবেলায় আমার তোমাকে খুব ঈর্ষা হতো, আবার ভালোও লাগত। মনে হতো তুমি বুঝি রূপকথার মানুষ। কেন মনে হতো বলতে পারব না, তবে তখন বয়েস আর-একটু বেশি হলে হয়তো-বা ভালোই বেসে ফেলতাম।" বলে, এবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তমালী। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে কথাকে যেন বাতাসে আলতো ভাসিয়ে দিয়ে বলল, "বেসেছিলাম কি?" আবারও হেসে উঠল ঠিকই, কিন্তু সে-হাসিটুকু আড়ালের।

"ফাজলামি রাখ।" পতিত আড়ালটুকুকে থিতিয়ে দিতে চেয়ে নিজের দৃষ্টিকে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে বিক্ষিপ্ত করে নিয়ে বলল। সে-ও কি আড়াল পেতে চেয়েছিল? কিন্তু সে তো হেসে উঠতে পারল না। পারল না কথাকে আলতো ভাসিয়ে দিতে। বরং কর্কশই শোনাল তার উচ্চারণ।

"ফাজলামি মনে হলো পতিতদা? ফাজিল হলে কি এতক্ষণ ধরে তোমাকে এত কথা বলতে পারতাম?" বলে, একটু অন্যমনস্কতার ভিতর সেঁধিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই ফিরে এল সমনস্কে: "অনেক গল্প হলো, এবার তুমি বরং জিরিয়ে নাও সামান্য।" একটু কি তাল কেটে গেল তমালীর? অভিমানী শোনাল কথার ভার?

"আচ্ছা রে আচ্ছা, রাগ করিস না। ভুল হয়েছে আমার।" এবার তমালীর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বলল পতিত। "একটা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি?"

"আগে তো প্রশ্নটা শুনি।" কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে জবাব দিল তমালী। "একা একা এই এত্ত বড়ো বাড়িটাতে নিজেকে তোর বন্দি মনে হয় না? এই শহরটাকে— যেখানে তোর আপন বলতে কেউই নেই? "

"বন্দি লাগবে কেন। সত্যি বলতে গেলে, মাসিমার মৃত্যুর পর আমি তো মুক্তই একেবারে। কোনো পিছ্টানও নেই আর।"

"সত্যি বলছিস? মুক্ত একেবারে? কিন্তু পিছ্টান কথাটার মধ্যেই একটা দ্বিধা..."

"দাঁড়াও দাঁড়াও। আবারও গল্প জুড়তে চাও নাকি তুমি! কিন্তু আমার কথা যে ফুরোল পতিতদা, নটেগাছটিও মুড়োল।"

"তুই না বললে আর শুনতে চাইব কেন গল্প? তবে জানিস তো কোনো

কাহিনিরই তো শেষ হয় না। এমনকী নায়ক-নায়িকার মৃত্যুও ইতি টেনে দিতে পারে না। লেখক চাইলে এমনও হওয়া সম্ভব যে, কোনো গল্পের শুরুই হলো মূল চরিত্রের মৃত্যু দিয়ে; আর সেখান থেকে পিছনে না হেঁটেও সময় গেঁথে দিল এমন কিছু মুহূর্ত যেন মৃত্যুই ঘটেনি কোনো। সামনেটাই আছে, পিছনের সেই মরণ আসলে মায়া।"

"সত্যি পতিতদা, কথারা তোমার মুখে জাদু হয়ে যায়। মনে হয় বিশ্বাস করি, কিন্তু অবিশ্বাস্যই থেকে যায় তা। ছোট্টবেলায় কি সে-কারণেই ভালো লাগত তোমাকে?"

তমালী বারবার নিজের ছোটোবেলাকে স্মরণ করে পতিতের প্রতি ওর ভালো-লাগার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সামান্য বিব্রত হয়ে ওঠে সে। বলে, "তা জানি না। তবে লোকে বলে আমি হলাম অকেজো মাল। বাপের পয়সায় খাই, ঘুমাই আর অস্থানে-কুস্থানে ঘুরে বেড়াই। অন্যের বাড়া ভাতে ছাই দিতে ওস্তাদ। ইদানীং আমার নিজেরও কথাটা একটু একটু বিশ্বাস হতে লেগেছে।"

"তাই বুঝি! তো এখানে যদ্দিন আছ, একটু আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ো নাহয়। সেই ছাই-দেয়া ভাত খেয়ে প্রাণ জুড়াব আমি। কমলপুর ছাড়ার পর কতদিন যে ছাইভাত গলা দিয়ে নামেনি!"

"আমার কি ঠিক আছে কোথায় যাই? তবে বেনারস থাকাকালীন নিশ্চয় আসব দু-একবার। ভবঘুরে যাকে বলে সে তো আমি নই, বেশ থিতু হয়েই কাটিয়ে দিলাম বয়েসের এতটা কাল। কিন্তু এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় হয়। এবারে ফিরতে হবে আশ্রমে।"

"না ফিরলেই-বা কী। আশ্রমের ঘর জোর করে খুলে তোমার জিনিসের দখল নেবে না কেউ। নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া ওখানে জিনিসপত্রের আছেই-বা কী যে নেবে! সবই তো চুরি গেছে?"

"ঠিক আছে। এখন এক কাপ চা খাওয়া দেখি।"

"ছি ছি ছি। কথার নেশায় সব ভুলেছি। ইশ্!" বলে তমালী জিভ কেটে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে।

ওর চলে-যাওয়ার মুহূর্তকে অনুসরণ করতে করতে পতিতের মনে হলো কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে তমালীর জীবন জুড়ে। একটু ঝাড়া দিলেই বোঁটা থেকে পাকা ফলের মতো মুক্ত হয়ে ঝরে পড়বে সেইসব। যেন চাপা

সেই রহস্যকথা শোনাতে পারলে স্বস্তি পায় ও। এতক্ষণ যা-কিছু বলে গেল সেসব কি তবে ভূমিকা মাত্র? তমালীর অন্তস্তল থেকে যে-কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চাইছে, তা কি কনফেসন কোনো? কিন্তু পতিত তো মেসিয়া বা পাদরি নয়। কিংবা ধর্মগুরু। নিজের সঙ্গে নিজেই তো কথাগুলোকে ও কতবার নাড়াঘাঁটা করেছে, তবু অন্য মানুষ, পতিতের মতো হঠাৎ-ফিরে-পাওয়া একজন, যার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো আর যোগাযোগই ঘটবে না, তারই কাছে কেন উজাড় করে দিতে চাইছে এতদিনকার গভীর গভীরতর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, লোভ-ঈর্ষা, কামনা-বাসনা, আশা-নিরাশা? উজাড় কি সম্ভব? মানুষ কি পারে নিজেকে নিজের থেকে জাল কেটে বের করে নিতে? জানে, নিজেকে অন্যের কাছে ব্যক্ত করে তুলতে?

এই কথা মনে হয় পতিতের। মনে হয়, কারণ, সে দেখেছে এতদিন ধরে তার নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত সব কথা আসলে কথাকে চাপা দেয়ার জন্যই বানিয়ে বানিয়ে তোলা। হ্যালুসিনেশন। সেসব ব্যক্ত-হতে-চাওয়া কথোপকথনই হোক, বা ডায়রির পাতায় পাতায় লিখে-রাখা শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ। আসলে কনফেসন হলো এক উচ্চমার্গীয় প্রতারণা, আত্মোন্মোচনের নামে ক্রমশ জটিল ছদ্মবেশ, আত্মগোপন করে-ফেলা সূক্ষ্ম-স্থূল— এমনকী সহজ বিষয়গুলোকেও। মানুষের চিন্তাভাবনা কোনোদিন তাকে সারল্যের কাছে পৌঁছে দেয় না। কারণ, সত্য আশাহত করে, মিথ্যাই করে তোলে আশান্বিত।

"এই নাও চা।" তমালীর হাতের থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে পতিত ঘরের ভিতর নতুন করে ফের প্রবেশ করল যেন।

এরপরের সমস্ত ঘটনা ঘটে-যাওয়া অংশের পুনর্নির্মাণ। সেই রাতে আশ্রমে ফিরে পতিত সদ্য-কিনে-আনা খাতায় লিখে রেখেছিল তা। পুনর্নির্মাণের প্রতিলিপি। এই প্রতিলিপির কোনো সন-তারিখ নেই। এমনকী, খাতাটায় অন্য কোনো লেখাও নেই আর। আশ্চর্য!

> *বিস্ময় যে এভাবে প্রতীক্ষা করেছিল বেনারসের একটি দিনের ভিতর, আমি অবাক হবার মতো জোরও হারিয়ে ফেলেছি। পলাশের বোন তমালীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা এখন আমার আর চমক বা কাকতালীয় মনে হচ্ছে না, এ যেন অনিবার্যই ছিল। অনিবার্য না হলে আমি আমার জীবনের টুকরো টুকরো, নেহাতই অগোছালো সব*

ঘটনাগুলোকে কোনোভাবে সাজিয়ে তুলতে পারতাম না। মানুষের জীবন তো আসলে প্রত্যেক মুহূর্তে সময়েরই পুনর্নির্মাণ, কেবল ঘটনাপ্রবাহ নয়; সেই বিশ্বাস আজ দৃঢ়তা পাওয়ায় ভিতরে ভিতরে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে আমি বুঝি শিল্পী এক; যে-মাধ্যমই দেওয়া হোক-না-কেন, ছবি-ভাস্কর্য-গান-কবিতা-গল্প, আমি এখন যা সৃষ্টি করে তুলতে পারি, তা চিরনতুন, চিরকালীন— ভবিষ্যতে কোনো মানুষের কল্পনাও সেই অভিনবত্ব ও নিত্যতাকে খুঁজে পাবে না। কেবল অস্তিত্বের ঘনায়মান সজীবতা একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে ছিল ও থাকবে— অতীতে আর ভবিষ্যতে, বর্তমান হলো মায়া।

তমালীর বাড়ি থেকে আশ্রমের মাত্র দশ মিনিটের পথ আমার অতিক্রম করতে লেগেছে পাক্কা একটি ঘণ্টা। বারবার টলে টলে পড়ছিলাম পথের উপর। নেশাগ্রস্ত মাতালের বেহায়াপনায়। অসহায় অথচ উৎকেন্দ্রিক সেই চলার ছন্দে ছিল অদ্ভুত এক ফুরফুরে আমেজ। এতেই আন্দাজ করা যেতে পারে, এখনও আমার ভিতরে কীভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে আজকের সন্ধ্যের রেশটুকু।

তমালী বলেছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার ট্রেনে চড়ে বসতেই ওর মনে হয়েছিল কেউ একজন অনুসরণ করে চলেছে ওকে। ঘটনার শুরু টিকিট কাউন্টার থেকে। কিন্তু কামরায় তেমন কাউকে নজরদারি চালাতে না দেখে সেই ভাবনার পরদা থেকে তার মন সরে গিয়েছিল। কিন্তু আসানসোলে এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোককে কামরার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ও। হাওড়ায় পৌঁছে প্ল্যাটফর্মে নামার পর সেই ভদ্রলোকটিকে ওর ঠিক পাশে পাশে যখন অবলীলায় হেঁটে যেতে দেখল, তখন অস্বস্তির সঙ্গে ভয়ের একটা টানাপোড়েনে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি না বেরিয়ে যাত্রীপ্রতীক্ষার একখানা ফাঁকা চেয়ারে গিয়ে বসে অপেক্ষা করতে থাকে ও। প্রধানত দুইটি কারণে— প্রথম, লোকটা যেন তার ত্রিসীমা থেকে বিদেয় হয়; দ্বিতীয়, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবে, সম্ভাব্য কোন্ আশ্রয় যুক্তিযুক্ত হবে সেটা মনঃস্থির করে নিতে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাবনার জন্য ওকে কোনো অবকাশ না দিয়ে সেই ভদ্রলোক ঠিক ওরই পাশটিতে বসে সরাসরি প্রশ্ন করে বসে: "পালিয়ে তো এসেছ, পরিচিত কেউ আছে এ-শহরে যেখানে যেতে পার তুমি?"

এরপর তমালী আর সেই লোকটির মধ্যে ধীরে ধীরে আরও অনেক কথাই হয়, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেদিনই ভদ্রলোকের সঙ্গে রাতের ট্রেন ধরে তমালীর বেনারসে প্রত্যাবর্তন, ভদ্রলোকের মায়ের দেখাশোনা করা, পড়াশুনা ও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। মাসিমা বেঁচে থাকতে ভদ্রলোক মাঝেমধ্যে যাতায়াত করলেও থাকতেন না বেনারসের বাড়িটিতে। উঠতেন হোটেলে। মাসিমার মৃত্যুর পর কখনো আর এ-মুখো হননি। মাসিমা ছিলেন খুবই দয়ালু প্রকৃতির, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত। তমালী যদি বামুনের মেয়ে না হতো, কিছুতেই ওর সঙ্গে থাকতে রাজি হতেন না তিনি। একমাত্র ছেলের কাছে তাঁর না-থাকার কারণটাও আর কিছু নয়, জাতপাতের শুচিতারক্ষা। যেদিন শুনলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে যে-মেয়েটিকে বিয়ে করতে চলেছে, সে-মেয়ের বংশমর্যাদা সমগোত্র নয়, ছেলেকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন, তাঁকে যেন অবশ্যই বেনারসে রেখে আসা হয়। মাসিমা বেঁচে থাকতে, এমনকী তাঁর মৃত্যুর পরও, কোনোদিন ভদ্রলোকের স্ত্রী এ-বাড়িতে পা রাখেননি। এতদিন ধরে এখানে আছে তমালী, সেই মহিলার বিষয়ে কিছুই প্রায় জানে না। শুধু এটুকু বুঝেছে যে, ভদ্রমহিলার আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত তীব্র; ঠাকুমার সঙ্গে পরিচয় করাতে বাবার সঙ্গে একমাত্র নাতনিকেও কখনো পাঠাননি বেনারস। তবে হ্যাঁ, ঠাকুমার মৃত্যুর পর কলেজের এক্সকারশনে এসে মেয়েটি দিন দুই কাটিয়ে গিয়েছিল এ-বাড়িতে। থাকতে চায়নি অবশ্য, কিন্তু তমালীর একান্ত জোরাজুরিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল এই শর্তে যে, মা-বাবা যেন কোনোদিনও জানতে না পারেন তা। সেই মেয়ে, মল্লিকা যার নাম, প্রথম দেখে যাকে মনে হয়েছিল তমালীর, যেন কম বয়সের পলিদিকেই দেখছে। মাত্র দু-দিনের সম্পর্কে তমালীর সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল মেয়েটির যে, ও তমালীর কাছে ওর প্রেমিকের বিষয়ে আলাপ পর্যন্ত করেছিল। প্রেমিক ছেলেটি পড়াশুনায় ভালো হলে কী হবে, চাকরিবাকরির দিকে কোনোই আগ্রহ নেই। বাবার বিশাল মেডিসিন আর ছাপাখানার ব্যাবসা। অঢেল পয়সা। সে-ছেলে দিনরাত্তির সামাজিক কাজকর্ম করে বেড়ায় আর ইচ্ছে হলে প্রেসে গিয়ে একটু-আধটু দেখ্‌ভাল করে। বাবাকে নিয়ে মল্লিকার হয়েছে মুশকিল, কারণ বাবা ওদের সম্পর্ক মেনে নিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। ছেলেটি ওদের স্বধর্ম নয়।

এইসব কথার ফাঁকে ধীরে ধীরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। অন্ধকারে ডুবে-থাকা ঘরের পুব-দেয়ালে টাঙানো একটা ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফে হঠাৎ পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যের মৃদু আলো এসে পড়াতে সেইদিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম আমি। কাছে এগিয়ে একটু ভালো করে ঠাহর করতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বেশ কয় বছর আগেকার এক দৃশ্য: একটি অফিসের রিসেপশনের সামনে আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে ধরেছেন সুটেড-বুটেড মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক। পলিদির সেই স্যার। ফোটোগ্রাফের মধ্যে একজনের চেহারা যেন অবিকল তাঁরই মতো! আমার হাবভাব দেখে তমালী ফোটোগ্রাফের মানুষজনদের পরিচয় জানাতে উদ্যত হলে আমি শুধু ওই ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে চাইলাম এবং তমালীর উত্তরে জানলাম সেই ব্যক্তি মাসিমার ছেলে।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যের বিস্তৃত সময়ের পরিসরে নানা কথার ফাঁকে তমালীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তমালী কোন্-এক গূঢ় ভাবনার গোপন ভাষায় বার বার তলিয়ে গিয়ে নিজের অন্তঃস্থকে ছেনেছুনে ধুলো-বালি-কাঁকড়ের স্তরে হারিয়ে-যাওয়া কোনো-এক অনুভাবের স্মৃতিকথা আমাকে বলি বলি করেও বলে উঠতে পারছে না। মনে হলো, সত্যি তো, সব কি উন্মুক্ত করে দেয়া সম্ভব? দেওয়া যায়? এই ছোট্ট জিজ্ঞাসাটুকু একসময় আমার মনের থেকে ধীরে ধীরে অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম আলোকছটার সঙ্গে মিশে পশ্চিম থেকে আরও দূর পশ্চিমের যাত্রাপথে হারিয়েই গিয়েছিল। ঘরের ভিতরে মৃদু হয়ে ছড়িয়ে-পড়া সন্ধ্যাস্তরাগ ক্রমশ তমালীর চোখ-মুখ-চুল-নাক-কান-গলা ও দেহের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বেয়ে মেঝের উপরে পড়ে অজানা এক মানবীর ছায়াকেই গড়ে তুলছিল, যেন সেই ছায়াস্পর্শ পেয়ে অন্ধকারের ছেঁড়া ছেঁড়া ভঙ্গিমা, অহং-বোধের থেকে ক্রমশ উন্মুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করার উন্মাদনায় চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হুমড়ি খেয়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল তমালীর শরীরের আগাপাশতলা। মনে হলো, কোনো রমণীর এমন মুখর রূপের, খোসা-ছাড়ানো কমলালেবুর গন্ধে বিভোর হয়ে-ওঠা দেহসৌরভের ঘনিষ্ঠতার, এমন মুখোমুখি হতে-পারার অভিজ্ঞতা জীবনের এ-তাবৎ অসংখ্য মুহূর্তনির্মাণ সত্ত্বেও কোনোভাবে সম্ভব হতে

পারেনি আগে। হ্যাঁ, পলিদির সঙ্গো যতদিনই কাটিয়ে থাকি-না-কেন আমি, যত কথাই বলে থাকি-না-কেন, এমনকী বৃষ্টিভেজা আমাদের সেই শেষ সাক্ষাতের স্পর্শকাতরতার ভিতরও আজকের এই মুহূর্তের মতো এমন সম্মোহিত হয়ে উঠবার অবকাশ হয়নি। ক্রমে একটু একটু করে শিথিল হয়ে আসছিল আমার চোখ-কান-মুখ-হাত-পা আর লাগামশূন্য অশ্বের ন্যায় আমি দিক্শূন্য তাড়নায় ছুটে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম কেন্দ্রাতিগ শক্তির টানে, এক অচেতন ভারশূন্যতায়। বিলীয়মান সূর্যের নম্র অনচ্ছ আলোয় আমার রোমকূপগুলি থেকে স্বেদবিন্দুরা ক্রমশ বাষ্পীভূত হয়ে সেই ঘরে ভাসতে ভাসতে আরও আরও অস্বচ্ছ করে তুলছিল চারপাশকে। নিরাবয়ব অথবা নৈরাকার এক অস্তিত্বের স্পর্শে ঘনীভূত হয়ে এসেছিল অন্যতর এক সাকার অনুভূতিদেশ, আমি যেন তার অতলে ভেসে ভেসে খড়কুটোর মতো খুঁজে চলেছি আলিঙ্গন। রক্তমাংস। হয়তো তারস্বরে ডেকে উঠতে চাইছি কাউকে, কিন্তু কণ্ঠ আমার কী এক মাংসল নিষ্পেষণে বাক্‌রহিত হয়ে শুধুই দমচাপা আর্ত ধ্বনিকে নির্গত করে আনছিল। সে কি আমারই নিঃশ্বাস? জানি না, জানতে চাইওনি; শুধু জেনেছিলাম, বুকের ভিতর সমস্ত প্রাণবায়ু সঞ্চিত করে আমি তখন কেবলই জলে ডুবতে ডুবতে নিজেরই প্রশ্বাসের সন্নিবদ্ধ হয়ে কোনোরকমে কিছু-একটা আঁকড়ে ভেসে থাকতে চাইছিলাম প্রাণপণ। সেই আশ্রয় ছাড়া, সেই আশ্রয়ের নির্ভার অবলম্বন ছাড়া আমি যেন শুধুই ছায়াপিণ্ড এক। তারপর কেটে গেছে কতক্ষণ? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? আর তারপর, ঘুমের থেকে জেগে স্নায়ুতন্ত্রর নিবিষ্ট মুদ্রামুহূর্তের ভিতর দূর এক ঝরনাধ্বনির কলতানে অপসৃয়মাণ আলোর মধ্যিখানে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম তমালী নামের মেয়েটিকে: মোমবাতির মতো কম্পিত শিখার নীচে গলে গলে পড়া মোমের এক ভাস্কর্যকে। ভয়ে, শিহরনে সজোরে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম গলিত মোমের সেই অসহায় অবলম্বন। দেখি, মোমের বাতি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে-ই: নিজেকে দগ্ধ করে চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে শিখা। মনে হলো আগুন ছুঁয়েছি, সেই আঁচে নিজের ভিতরে নিজেই শুষে নিয়েছি তাপ, আর, ক্রমশ শুদ্ধ হয়ে গলে গলে যাচ্ছি আমি, রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিতপাবন সীতারাম...

"দাদাবাবু, তোমার একখান কোরিয়ার আইছে।" দীপালিদি খবর দিল।

সকালের জলখাবার খেয়ে পতিত একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে তখন বারোটা। হরনাথদের বাড়ির ঘড়িতে ঘণ্টার শব্দ সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। সে বেরিয়ে এল বাইরে। সই করে কুরিয়ারের প্যাকেটটা নিয়ে বসবার ঘরে বসে সেখানা খুলে তো অবাক। এ যে তার সেই চুরি-যাওয়া ডায়রি! কে পাঠাল? প্রেরকের নাম স্পষ্ট নয়। তবে ঠিকানা বারাণসীর। ডায়রি খুলে ওলটপালট করতেই একটা ভাঁজ-করা কাগজ ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে পড়ল মেঝেতে। সেটা তুলে ভাঁজ খুলে দেখল অপরিচিত হাতের লেখা:

বারাণসী

মাননীয়েষু,

এই ডায়রি ফেরত পেয়ে আপনি হয়তো চমকে উঠবেন। সম্প্রতি ঘর গোছাতে গোছাতে পুরোনো বইপত্তরের ডাঁই থেকে আবিষ্কার করি এটিকে। আমি সত্যিই জানি না কীভাবে এবং কতদিন ধরে এখানা পড়ে আছে আমাদের বাড়িতে। আগ্রহবশত গোটা ডায়রিটাকেই পড়ে ফেলি আমি। পড়তে পড়তে নানা বর্ণনায় যেমন অবাক হয়েছি, তেমনই মনে হয়েছে এর লেখক যেন আমার কতদিনের পরিচিত। একসময় আমরা কলকাতার নিকটবর্তী মফস্‌সল শহরে থাকতাম। তাই ভালো করে নাম-ঠিকানায় নজর করি, কিন্তু কমলপুর জায়গাটা কিছুতেই চেনা ঠেকল না। পরে অনেক ভেবে দেখলাম, এটিকে অবশ্যই আমার রচয়িতার কাছে ফেরত পাঠানো উচিত। আপাতদৃষ্টিতে ডায়রির পৃষ্ঠাগুলোকে আমার অক্ষতই মনে হয়েছে, তবু কোনো কোনো অংশে পেনসিলের আঁকিবুকি আছে। এছাড়াও যদি এর কোনো অংশ নষ্ট হয়ে বা খোয়া গিয়ে থাকে, তারজন্য কোনোভাবেই দায়ী নই আমি। আমার আগে, যে বা যারা এটি নাড়াঘাঁটা করেছিলেন, তাঁদেরই বর্তায় সে-দায়ভার। ডায়রি পড়তে পড়তে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সাধ জেগেছিল খুব। কিন্তু এও জানি, কোনোমতেই সম্ভব নয় তা।

ভালো কথা, প্রেরকের যে নাম-ঠিকানা দেয়া আছে এতে, সেটি আমার বিশেষ পরিচিত একজনের। কৌতূহলে বা কৃতজ্ঞতার কারণে তাঁকে কোনোভাবে বিব্রত না করাটাই অভিপ্রেত। কী বলেন?

ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

বিনীত,

সাল-তারিখ-নাম বিহীন চিঠিটিকে দ্বিতীয়বারের জন্য পড়ে পতিত বুঝে নিতে চাইছিল প্রেরক নারী না পুরুষ। হাতের লেখার ধরন দেখে সামান্য মেয়েলি মনে হলেও ভাষা পুরুষালি। অথচ আশ্চর্য এই, তার কেন জানি ভাবতে ইচ্ছে করছিল এ-চিঠি পাঠিয়েছে অবশ্যই কোনো মেয়েমানুষ। ডায়রির লেখাগুলো সেই অপরিচিতা পড়ে থাকলে যেন বেশ তৃপ্ত হবার সুখ পেতে পারে সে। তবে কি পাতাগুলোকে সে দিনের পর দিন ভরিয়ে তুলেছিল মেয়েদের কথা মনে রেখে?

চিঠির দুটো লাইন রহস্যই মনে হলো পতিতের: 'ডায়রি পড়তে পড়তে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সাধ জেগেছিল খুব। কিন্তু এও জানি, কোনোমতেই সম্ভব নয় তা।' আনমনে তখন ডায়রির পাতাগুলো উলটাতে উলটাতে হঠাৎই চোখ থমকে গেল কয়েকটি লাইনে। লাইনগুলোর নীচে কে যেন কালিতে দাগিয়ে রেখেছে। সে নিজে কোনো রচনার, এমনকী বইয়ের কোনো অংশে কালি দাগানো বরদাস্ত করতে পারে না! বরং মুদ্রণ-প্রমাদ থাকলে পেনসিলে কখনো কখনো পাশে শুদ্ধ বিকল্প চিহ্নিত করে রাখে। কিংবা কোনো নোট। তবে কি পাঠক দাগ-কাটার ভিতর দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিল? স্বভাবতই পতিত লেখাটাকে আরও একবার মনোযোগ সহকারে পড়ল:

কী যে অদ্ভুত এক অস্থিরতা নিয়ে আমি আজ তোমার নিভৃতে ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনতে চেয়েছিলাম আমার নিজের বিষণ্ণতা, কে জানে! তুমি প্রশ্রয় পেয়ে হঠাৎ আলো নিভিয়ে নিঃসঙ্গতা নিয়ে এলে চারপাশে। আমি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি গলগল করে ঢুকে পড়ছে জমাট আঁধার। চাপা আর্তনাদের মতো একটা সুর এসে আমাকে করে তুলেছে ব্যর্থ। আমি অবলম্বন পেতে চাইছিলাম, অথচ কেউ তো নেই আশেপাশে। শুধু সতেজ একটা গন্ধ। সেই গন্ধ ধীরে ধীরে আমার

স্নায়ুগুলোকে শুষে নিচ্ছিল কোন্-এক নিশ্চেতনের দিকে। মনে হলো এই অবসান, এরই অপর নাম বুঝি মৃত্যু। মনে হলো, হাতের কাছে কোনো অস্ত্র পেলে আমি নিজের উপর নিশ্চিন্তে এখন তা চালনা করে অনায়াসে মরে যেতে পারি। আর তৎক্ষণাৎ, ঠিক তখন-তখনই আমার করতলে টের পেলাম বাষ্পঘন এক স্পর্শানুভূতি। সে কি স্বেদ, না কি চুম্বন, না অশ্রুবিন্দু?
৬ আগস্ট ১৯৮৪

পতিত কোনোভাবেই মনে করতে পারল না এই লাইনগুলো কোন্ ভাবনার থেকে একদিন লিখে রেখেছিল। এমন কী ঘটেছিল সেদিন যে, দুঃখকে, বা মৃত্যুকেই আপনার করে পেতে চেয়েছিল? যে 'তুমি'র কাছে নিজেকে সমর্পিত করে পতিত যাচ্ঞা-বাসনায় হয়তো-বা, কিংবা অভিমান-ভরে নিরুদ্ধ চেতনায় হয়ে উঠতে চেয়েছিল আকাঙ্ক্ষাকাতর, সে কি রক্তমাংসের অস্তিত্ব কোনো? না কি নিতান্ত অগোছালো এক স্বপ্ন? তবু এই কথা বেশ মনে করতে পারছিল যে, সেসময়ে ডায়রিতে অনেক কথাই সে লিখে রাখত, যা হয়তো ঠিক স্বপ্নও না, আবার কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণও নয়। সেইসব ছিল যেন সত্যাসত্যের মধ্যে নিহিত যে-কুহকশূন্যতা, তার ওপরে নিরাবলম্ব ঝাঁপিয়ে পড়ার বিলাসবাসনা। এই লেখাগুলোকে কি ইতিহাস বলা যায়? বাবা যেমন চেয়েছিলেন তেমন কথা লিখতে হলে যে-চোখ লাগে, যে-তথ্যছবি চিত্রিত করে তুলতে হয় লেখনীতে, নিজের জীবনের ঘটনাপ্রবাহে তেমন জোর বা উৎসাহ কোনোদিনই খুঁজে পায়নি পতিত। চারপাশ থেকে নিজেকে প্রাণপণে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, একটা লক্ষ্মণরেখার ভিতরে সে কাটিয়ে দিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই বয়ঃকাল। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও তবু ভালোবাসার মানে খুঁজতে গিয়ে স্মৃতির ভিতরে সময়কে জুড়ে জুড়ে গিয়েছে। অথচ ইদানীং সব কিছুতে চোখ রাখলে তার নিজেকে বেমানানই বোধ হয়। মনে হয় চেষ্টারা মৃত: গভীর থেকে গভীর বিস্মরণে তলিয়ে গিয়েছে।

"পতিত! বাড়ি আছ না কি? প-তি-ত!" হরেনদার গলা না? চট করে ডায়রি আর চিঠিটাকে লুকিয়ে ফেলল সে।

"কে? হরেনদা?"

"হ্যাঁ ভাই। বউমাকে সঙ্গে করে এসেছি। বউমার সামনেই একটা কথা

তোমাকে বলব মনস্থ করে।" হরেনদা তার ছেলে-বউ সঞ্জিতার সঙ্গে ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বললেন।

"কী এমন কথা যে, বউমার সামনেই বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল?" পতিত হেসে জানতে চাইল। তারপর বউটিকে সলজ্জ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার দিকে ফিরে বলল, "আরে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।"

"হ্যাঁ বউমা, বোসো। মিছিমিছি লজ্জা পাও কেন, লজ্জা তো আমার।" হরেনদার কথায় দ্বিগুণ লজ্জিত হয়ে সঞ্জিতা সোফার কোণ ঘেঁষে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে পড়ল।

"হ্যাঁ ভাই পতিত," বলতে থাকেন হরেনদা, "তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। মা-লক্ষ্মীকে আবার তুমি আমার ঘরে ফেরত এনে দিয়েছ।"

"আমি? আমি আবার কী করেছি?" প্রশ্ন ছাড়া বিস্ময়প্রকাশের অন্য ভাষা খুঁজে পায় না পতিত।

"না না। কী বলছ তুমি! তুমি গিয়ে ডেকে না আনলে অভিমানী মা কি আমার কোনোদিন আর ঘরে ফিরে আসত?"

"কে বলেছে গিয়েছি আমি? কী গো বউমা, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো কবে যে, হরেনদা এতসব বানিয়ে বানিয়ে আবোলতাবোল বকে চলেছেন?" অস্বস্তি সত্ত্বেও পতিত ইচ্ছে করেই হরেনদার সামনে সঞ্জিতার নাম উচ্চারণ না করে 'বউমা' সম্বোধন করল।

"বাবা ঠিকই বলছেন পতিতকা। আপনি তো গত পরশুই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি অবশ্য তখন ছিলাম না। ছেলেকে স্কুল ছুটির পর আনতে গিয়েছিলাম। ফিরতেই বাব-মা আপনার কথা বললেন। আপনি তাঁদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করে এসেছেন যেন অবশ্যই শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসি আমি। আপনার কথা ফেলবার ক্ষমতা হলো না আমার। গতকাল সন্ধ্যেয় তাই ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছি।" একনিশ্বাসে কথাগুলো বলল সঞ্জিতা।

পতিত ভাবল, তবে কি পাবন কোন্ ফাঁকে তার হয়ে প্রক্সি দিয়ে এসেছে? কিন্তু তাই-বা কেমন করে হবে? চেহারায় মিল থাকলেও বয়েস লুকোবে কী করে? অথচ আশ্চর্য, পতিত নিজে গিয়েছে সেখানে— এমনটা মনেই করতে পারছে না। মেয়েটির সঙ্গে অবশ্য মোলাকাত ঘটেনি পাবনের। সেইজন্যই কি সে ওই সময়টা বেছে নিয়েছিল? নাঃ, আজ রাত্রেই পাবনের

সঙ্গো ফয়সালা করে নিতে হবে এর।

"যাক," হরেনদা বউমার থেকে কথার খেই ধরে নিয়ে বললেন, "আসলে যে-কারণে তোমার এখেনে সাতসকালে আসা, সেই কথাটা বলি। বলতে পার এটা আমার স্বীকারোক্তি তোমার কাছে। আমি আর মৃণাল মূর্খের মতো লোকের কথায় তোমাকে জড়িয়ে আমাদের অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বউমাকে অপবাদ দিয়েছিলাম। তোমাকে যে সে আপন কাকার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে সেটা বোঝবার বুদ্ধি আমাদের লোপ পেয়েছিল। যার মনে পাপ, সে-ই অন্য সকলের ভেতর পাপ খুঁজে পায়। ছোটো বয়েসে জানা-শেখা এই সত্য কথাটাকে আমরা বড়ো হয়ে বেমালুম ভুলে যাই বা ভুলেই যেতে চাই। চোখে দেখার চেয়ে কানে শুনে সব কিছু দেখাটা পছন্দসই হয়ে হঠে। অন্তত আমি আর মৃণাল দু-জনেই যে সেই বোকামিতে মজেছিলাম তাতে ভুল নেই। আজ বউমার সামনে তোমার কাছে সত্য কথাটা বলে অনেক হালকা হয়ে গেলাম। এখন তুমি আমাদের বাপ-ব্যাটাকে ক্ষমা করে দিলে প্রাণ জুড়ায়।"

কথাগুলো বলতে বলতে পতিত লক্ষ করল হরেনদার মাথা ক্রমশ হেঁট হতে হতে থুতনির প্রান্তটুকু ওঁর বক্ষদেশ ছুঁয়ে ওঁকে ন্যুব্জ করে ফেলেছে। পাশে-বসা সঞ্জিতার দু-চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। ভারী-হওয়া সেই পরিবেশ হালকা করে নিতে পতিত বলে উঠল, "ছিছি দাদা, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি করব ক্ষমা? যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যান সব কিছু। এখন বরং একটু চা বলি। না কি শরবত?"

"কিচ্ছু না কাকাবাবু। আমরা এখনই উঠব।" সঞ্জিতা প্রত্যুত্তর করল।

"না, তা হয় না কি? তুমি প্রথম এ-বাড়িতে এলে, সামান্য কিছু মুখে না দিয়ে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। দী-পা-লি-দি—" হাঁক দিতে দিতে পতিত রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। মিনিট পাঁচ-সাত পরে দীপালিদিকে সঙ্গো করে চা নিয়ে যখন পুনরায় ফিরে এল ঘরে তখন মনে হলো অদ্ভুত এক মৃদু গন্ধের সহিষ্ণু আবেশে ভরে রয়েছে চারপাশ। আশ্চর্য! কোত্থেকে এল? কিছু আগে কি তবে তার ঘ্রাণশক্তির বাইরেই থেকে গিয়েছিল গন্ধটা? মানুষের জীবনে সামান্য যেটুকু আয়ুষ্কাল তাকে আরও সীমিত করে রেখে অনেক মুহূর্তই কি তবে ক্রমাগত নিঃশেষিত হয়ে যায়? পঞ্চেন্দ্রিয়, ষড়রিপু যার নাগাল পায় না?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে হরেনদা বললেন, "তোমাকে বউমা একটা কথা বলতে চায়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছে না। তার হয়ে আমিই নাহয় বলি—"

"যার কথা তার মুখ থেকেই তো শোনায় ভালো।" পতিত হাসতে হাসতে বলল।

"আমিও তো তাই বলি। হ্যাঁ বউমা, নিজের মুখেই বলো-না, এত লজ্জার কী আছে।"

পতিত দেখল, হরেনদার কথায় সঞ্জিতা আরও সংকুচিত শুধু নয়, বিচলিতও হয়ে পড়েছে। চায়ের কাপটাকে ঠিকমতো হাতে করে ধরে পর্যন্ত রাখতে পারছে না।

"আপনিই বলুন দাদা। বউমা আপনার সত্যিই খুব বেসামাল হয়ে পড়েছে।"

সঞ্জিতাকে সুস্থিত হবার সুযোগ করে দিতে চাইল পতিত, কিন্তু কথাটায় বরং আরও বড়ো সংকোচ এসে গ্রাস করল মেয়েটিকে: চুমুক দিতে গিয়ে সামান্য চা কাপের থেকে চলকে বুকের আঁচলে গিয়ে পড়ল। পতিত চোখ সরিয়ে নিয়ে হরেনদার দিকে চাইল যাতে সেই অবসরটুকুতে চলকে-পড়া চায়ের অংশ মুছে নিতে পারে ও।

"বউমা নাকি তোমার সঙ্গো কোন্-এক মানুষের খুব মিল খুঁজে পায়। অবশ্য সেই মানুষকে কস্মিনকালেও দেখবার সুযোগ হয়নি ওর। শুধু বেয়াইমশাইয়ের কাছে গল্প শুনেছে। বেয়াই আবার লোকটার কথা অন্য-একজনের থেকে শুনেছিলেন। অতএব বুঝতেই পারছ পতিত, বাপ-বেটির কেউই জানে না কে কবে প্রথমে কারই-বা কাছে লোকটার গল্প বলে শুনিয়েছিল। নানা মুখে প্রচারিত হতে হতে সেই মানুষের একটা ছবি শুধু ভেসে ওঠে। আসলে সে-লোক তার জীবনের নানা কথা একটা ডায়রির ভেতর একটু একটু করে লিখে রাখত। সেই ডায়রির থেকে মুখে মুখে যে-কাহিনি গড়ে উঠেছে, তারই গল্প বেয়াই বউমাকে বর্ণনা করেছিলেন।"

একটা ডায়রির কথা পতিতের জীবনে বার বার ঘুরে-ফিরে এসে পড়ায় সেও একইসঙ্গো অবাক ও বিহ্বল হয়ে পড়ল। সঞ্জিতার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "কী নাম মানুষটার? নিশ্চই লেখা ছিল ডায়রিতে।"

সঞ্জিতা চুপ করে রইল। হরেনদাই জবাবটা দিলেন: "সেইটেই তো রহস্যের। কেউই তার নাম বলতে পারে না। এত কথা মনে আছে সেই

লোকের বিষয়ে, অথচ কেউই তার কোনো পরিচয় বলতে পারে না।”

“এত কী কথা?”

“সবটা বলতে পারব না, তবু, এমন কিছু যেন আপনারই কথা। বাবার মুখে শুনে যে-মানুষকে আমি কল্পনা করে এসেছিলাম মনে মনে, বিয়ের পর কমলপুরে এসে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই মনে হয়েছে আপনি আর সেই মানুষটি যেন হুবহু এক।” এতক্ষণের জড়তা কাটিয়ে, আবরণের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে, তবু, সমীহ সংযমে প্রথাসিদ্ধ ইতস্তত ভাবের অভ্যাস টেনে টেনে কথাগুলো ধীরে ধীরে বলল সঞ্চিতা। পতিতের মনে হলো, উষাকুয়াশার আলো গাছের শরীরে পড়ে বিচ্ছুরিত হতে পারার মতো অবকাশ পেয়ে অবশেষে নানা তরঙ্গে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। সঞ্চিতার থেকে আরও কিছু শুনতে চেয়ে সে তাই জিজ্ঞাসা করল, “যেমন?”

“যেমন-তেমন বলতে পারব না বিশদ, কিন্তু ডায়রি থেকে নানা দিনের যেসব বিবরণ বাবা শুনিয়েছিলেন, তাতে করে এই কমলপুর, আপনাদের বাড়ি, আপনার ছবিই ভেসে ওঠে।”

“তুমি কি বলতে চাও ওই ডায়রির লেখাগুলো সব আমার?” পতিতের কথায় প্রশ্নের চেয়ে বিস্ময়ই যেন বেশি। মনে হলো, তবে কি হারানো সেই ডায়রি নানাজনের হাত ঘুরে ঘুরে, নানান কথার আলাপে আলাপে ক্রমশ সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়ে গিয়েছে? ডায়রির পতিত জ্যান্ত হয়ে উঠলে এই পতিতের পরিচয়টাই তো যাবে বদলে। মনে হলো অদৃশ্য কোনো ডিটেক্‌টিভ তার অতীত জীবনের ছোটো-বড়ো বিস্মৃত মুহূর্তের রহস্যকে উন্মোচিত করে তাকে নাঙ্গা করে দিতে চাইছে সর্বসমক্ষে। এতদিন পরে কেন নানা সূত্রে সেই খোয়া-যাওয়া ডায়রির প্রসঙ্গ আলোচিত হবে? হঠাৎ করে ফিরেও পাবে সেটা? কে ওই ডিটেক্‌টিভ? কী পরিচয় তার? সে কি পাবন? হঠাৎ সন্দেহ হলো তার।

সন্দেহকে আরও চাগিয়ে দিয়ে সঞ্চিতা বলল, “কার লেখা সেই ডায়রি জানতে তো ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা না জানলেও বাবার বিবরণ থেকে আমি বেশ বুঝি সেই লেখকের সঙ্গে আপনার দারুণ মিল। আপনাকেই বিশ্বাস হয়।”

এরপর আর কীই-বা বলতে পারত পতিত! স্বভাবতই পতিতের নীরবতায় ঘরের ভিতরে ক্রমে নেমে এল চাপা নৈঃশব্দ্য। সময়কে কিছুক্ষণ

আরও অতিবাহিত হতে দিয়ে হরেনদা আর তার বউমা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সমস্ত বাড়িটায়, প্রতিটি আনাচে-কানাচে অদ্ভুত এক অধৈর্য ফেলে রেখে।

গত তিন-চার দিন ধরে নিপাত্তা ছেলেটা। পতিত ভাবল, ভালোই হয়েছে। কাজের কথা বলে বলে মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছিল।

তবু, যেন এক অস্বস্তি পেয়ে বসেছে। পাবনের সঙ্গে এ-ক'দিনে যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাতে ওর অনুপস্থিতি কেমন নিঃসঙ্গও করে তুলেছে। অথচ মার মৃত্যুর পর গত দশ বছরে তো এমন সঙ্গহীন জীবনের মধ্য দিয়ে বেঁচে-থাকাটাকে সে অভ্যাসই করতে চেয়েছে। সেই অভ্যেস ক্রমশ তার দৈনন্দিনতার সঙ্গে জড়িয়ে কত-না ঘটনার সাক্ষ্য করে নিয়েছে তাকে! এইসব ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে সে-ও মানানসই হতে হতে এক ভারশূন্য ভেসে-থাকার সুখী-অনুভব পেয়ে এসেছে। তার জীবনে হঠাৎ করে পাবনের প্রবেশ তবে কি পতিতকে পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের টানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্থিত এক জান্তব আলম্বে পরিণত করে ফেলতে চাইছে? সময়কে ক্রমশ করে তুলতে চাইছে আঁটোসাঁটো? যেন তারই স্নায়ুকোষের ভিতরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাদের অভ্যন্তরে এক অচ্ছেদ্য অনুভূতির সূত্র ধরে দেশ-কালের অস্তিত্বকে পরিণত করতে চাইছে কখনো নিয়ন্ত্রিত, শাসনাধীন; আবার কখনো-বা পরদায় ধরে-রাখা প্রিজমের ভেতর দিয়ে প্রতিসৃত আলোর খণ্ড খণ্ড প্রক্ষেপের মতো ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত। ইদানীং সমস্ত ঘটনাকে তাই মনে হয় অনেক আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে যেন, সেগুলো লোকগাথার টুকরো টুকরো অংশবিশেষ।

এইসময় উত্তরের জানালা দিয়ে চোখ চলে গেল বাগানের দিকে। তাই তো, পাবনের অনধিকার প্রবেশের পর থেকে বেমালুম ভুলেই তো গিয়েছিল অত সুন্দর বাগানটার অস্তিত্বের কথা! পতিত আর দীপালিদির ছেলে মনোজ, দুই জনে মিলে যেসব সবজির গাছ লাগিয়েছিল সেগুলোর খোঁজই নেয়নি সে এতদিন। মনোজও কি আসেনি? 'দীপালিদি' হাঁক দিয়ে সে চলে এল রান্নাঘরের সামনে। দীপালিদি তখন শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল। মুখ তুলে চাইতেই পতিত বলল, "মনোজ কি এ-ক'দিন বাগানের দেখভাল করতে আসেনি?"

"আইছিল তো!" দীপালিদি বলল।

"আমাকে খবর দাওনি কেন?"

"তোমার কি শরীল ভালো ছেল, না মন আছিল বাগানে যে খবর দোব?"

কথা না বাড়িয়ে পতিত খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাগানে। এসে চমকে উঠল। দেখল, বেগুন আর টমেটোর চারাগুলো পতপত করে বড়ো হয়ে উঠেছে। গাছেদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল সে। কিন্তু বুঝে পেল না কী করবে। এই ক-দিনের অনুপস্থিতি গাছগুলোর সান্নিধ্য ও অস্তিত্বের থেকে পতিতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। গাছগুলোর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবল আগাছাগুলোকে কি সাফ করে দেবে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো সেটা করতে গিয়ে যদি ওদের মূল শিকড়েই টান পড়ে ছিঁড়ে যায়! একটু কি তবে জল ঢেলে ভিজিয়ে দেবে ওদের? কিন্তু গোড়া দেখে ঠাহর হলো প্রয়োজন নেই তার, যথেষ্টই ভিজে রয়েছে। মনোজ নিশ্চই সকাল সকাল এসে কাজ সেরে গিয়েছে। আসলে কোনো কাজই খুঁজে পেল না সে। এতদিন গাছগুলোর থেকে দূরে সরে থাকার দরুন কোনোভাবেই সম্পর্কটাকে তার পক্ষে জোড়া লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে পরিবেশ। তখন কী মনে করে অথবা নিজেকে অস্বস্তির সঙ্গে মানানসই করে নিতে নিতে পতিত গাছেদের ডালপালার থেকে বিবর্ণ পাতাদের খসিয়ে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে থাকল। কাজ করতে করতে পতিতের নজরে এল সবেদা গাছের পাতার ভিতরে অসংখ্য ছোটো ছোটো কুঁড়ি ও ফলের সমাগম ঘটেছে; বেশ কিছু মৌমাছি উড়ে উড়ে বসছে কুঁড়িদের উপর। মৌমাছিদের আনাগোনাকে জরিপ করতে করতে লক্ষ করল আমগাছে বড়োসড়ো একটা চাক। মৌমাছিরা ছোটো ছোটো দলে বেরিয়ে এসে নানা ফুলের থেকে রস টেনে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে সেই চাকের ভিতরে। ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে এসব দেখতে দেখতে পতিতের খুব ইচ্ছে হলো ধূমপানের। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো তামাকের উগ্র গন্ধ সহ্য করতে না পেরে হয়তো-বা এতসব মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য পতঙ্গের দল পালিয়েই যাবে। তাই চুপটি করে বসেই রইল। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডা আমেজ ভেসে এল। আকাশের থেকে সৌররেখারা মিলিয়ে গিয়ে গাছের পাতার ফাঁক ধরে ধূসর কালোর প্রিজম ছড়িয়ে মায়াবী করে তুলল বাগানটাকে। একটু দূরের কাঁঠাল গাছের ডালে ঝুলে-থাকা একটা দড়ির দোলনার আভাস ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে পতিতের দিকে এগিয়ে এল। বাঃ,

মনোজ তো খুব করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। তারিফ করল সে মনে মনে। জমি থেকে উঠে সেই দোলনায় বসবে মনে করে এগিয়ে গেল, কিন্তু আচমকা শুরু হলো বৃষ্টি। সদ্য অসুখ থেকে উঠেছে, তাই ইচ্ছে থাকলেও বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হবে না মনে করে এক ছুট্টে সে চলে এল বাড়ির ভিতর। তবু সামান্য ভিজেই গিয়েছিল। গামছা দিয়ে তখন নিজেকে ভালোভাবে মুছে, নামমাত্র ভেজা পোশাকটুকুকেও বদলে বৈঠকখানার ঘরে এসে বসল। অঝোর বৃষ্টির দাপটে দিনের বেলাতেও সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে যেন। তার মধ্যে যথারীতি কারেন্ট অফ্। অগত্যা সোফায় অলস শরীরকে এলিয়ে দিয়ে পতিত ট্রানজিস্টার অন করে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পছন্দসই স্টেশন ধরার চেষ্টা করে চলল। কিন্তু কোনো প্রোগ্রামই পছন্দ হচ্ছিল না। এক তরঙ্গ থেকে আর-এক তরঙ্গে ক্রমাগত পরিক্রমা করে যাচ্ছিল সে।

"পতিত, বাড়ি আছ নাকি?" খুব চেনা-চেনা অথচ ঠিক মালুম হচ্ছিল না এমন যেন কেউ ডাক দিল। পতিত দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল বিপিন আর তার বউ বৃষ্টিজল মাথায় করে দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার, দু-জনে তো এক্কেবারে ভিজে একশা হয়ে গেছিস বিপিন! একটা ছাতা-টাতা জুটিয়ে আসতে পারিসনি? আয় আয় ভিতরে আয়।"

"না না, ভেতরে না। এইখানেই ঠিক আছে। ঘর নোংরা হইব।"

"হোক নোংরা। তোরা ভিতরে না এলে কোনো কথা শুনব না আমি।" পতিত বলল।

"আসো সুজাতা। পতিত যখন কইতাছে—" বিপিনের বউয়ের নাম যে সুজাতা, এই প্রথম জানল পতিত। ঘরে ঢুকে দু-জনে মেঝেতেই বসতে নিচ্ছিল। পতিত ওদের দিকে তোয়ালে ও মোড়া এগিয়ে দিল। রেডিয়োটা বেজে যাচ্ছিল, সুইচ অফ্ করে সেটাকে শো-কেসের উপরে যথাস্থানে রেখে কিছুক্ষণ আগে সোফার যেখানে বসেছিল সে, ঠিক সেইখানেই এসে বসল। ওরাও যতটা সম্ভব গায়ের জল মুছে পাশাপাশি দুটো মোড়ায় জড়োসড়ো হয়ে বসল। পতিত প্রথম এত কাছ থেকে বিপিনের বউকে দেখল। সত্যি রূপ যেন ফেটে পড়ছে। এমন অসহনীয় সুন্দর সে আগে কখনো চাক্ষুষ করেনি। একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লে তাকে ফেরানো মুশকিল। বিশেষত তোয়ালে দিয়ে মোছার সময় ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের আড়াল থেকে উদ্ধত ঊর্ধ্বাঙ্গের যে-বিস্ফার তার চোখে তীব্র ফলার মতো বিঁধে গেল, তাতে

বুঝল, কিশোর কেন, কোনো পুরুষের পক্ষেই ও-রসে মজা বিচিত্র নয়। মধ্যবয়সি সুজাতার ফিগার ও বাস্ট যেকোনো অষ্টাদশী মডেলকেও অনায়াসে হার মানিয়ে দেয়। পাছে বিপিনের কাছে ধরা পড়ে যায়, জোর করে তাই চোখ সরিয়ে বিপিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ এবারে বল, হঠাৎ আমার কাছে কী কারণে।"

"তুমি একসময় যে আমারও খেলার সাথি ছিলা, সেইডা মানো তো?" বিপিন বলল।

"কী যে বলিস! ফুটবলে তোর মতো গোলকিপার আর ক্রিকেটে তোর মতো দক্ষ ফিল্ডার আমাদের মধ্যে কেউ ছিল নাকি তখন? কত কত ম্যাচ স্রেফ তোর কেরামতিতেই আমরা জিতেছি, সেসব ভোলা যায়? কিন্তু এখন আমাকে যেভাবে তুমি তুমি করতে লেগেছিস তাতে একটু সন্দেহই হচ্ছে তুই সেই বিপিন কি না।"

শুনে বিপিন একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর মুখে শান্ত হাসি এনে বলল, "অনেক দিন পর তো, তাই ভুল হয়্যা গ্যাছে। সরি। শোন ভাই, তোর কাছে একটা সাহায্য চাই। হরনাথ, তার দুই পোলা আর তাগোর যত চামচাগুলান একজোট হয়্যা আমাগো জেবন অতিষ্ঠ কইরা তুলছে, তার খবর শোনছস নিশ্চয়।"

"পুরোটা জানি না, তবে নিতাইদার মুখেই শুনেছি অল্প-স্বল্প।"

"লড়াইয়ে না পাইরা এখন ভাতে মারতাছে। বাজার থিক্কা আমারে উৎখাত কইরা অ্যাখন বাড়ি থিক্কাও তাড়ানোর ফিকির করতাছে। তোরা বন্ধুরা যদি এসময় পাশে না দাঁড়াস তবে আমরা যাই কই?"

"কিন্তু তোর বউ কিশোরের সঙ্গে পালিয়েছিল, সেটা কি সত্যি?" প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে পতিত খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল। নিজে থেকে না বললে কারও থেকে খুঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু কী করে যেন বেরিয়ে এল প্রশ্নটা। সে কী সুজাতার অমন রূপের কারণে? সুজাতার দিকে তাকিয়ে দেখল, মাথা নীচু করে আছে। নিজেকে ঘৃণ্য মনে হলো পতিতের। কথাটা ওভাবে বলাটা মোটেই উচিত হয়নি তার। সেও চোখ নামিয়ে নিল; নামাতেই টের পেল বিপিনের বউ অন্তঃসত্ত্বা। দাঁড়ানো অবস্থায় যখন গা মুছছিল তখন অত পষ্ট না হলেও এখন মোড়ায় পা দুটো ছড়িয়ে বসায় ওর শরীরে ভিতর থেকে সে-ইঙ্গিত স্পষ্ট জানান দিচ্ছে।

"হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু তাইতে ওর তো কোনো দোষ নাই। দিনরাত্তির আমার গঞ্জনায় অস্থির হইয়া অপমানে অমন কাম করছিল। বিয়ের এত বচ্ছরেও আমাগো কোনো পোলাপান না থাকায় পাড়াপড়শি ওরে বাঁজা কইত। কষ্ট হইলেও তাইতে বউয়ের আমার কোনো অভিমান ছেল না। কিন্তু লোকের কথায় অতিষ্ঠ হইয়া কিছুকাল হইল আমিও যখন ওরে কথায় কথায় গাল দিতাম, সন্দেহ করতাম, এমনকী, দু-একবার নেশার ঘোরে মারধরও করছি, তখন রাগে-দুঃখে-অপ্‌মানে আমারে শায়েস্তা করতে কিশোরের লগে পলায়। অ্যাই সুজাতা, পতিতরে কথাখান তুমিই বুঝায়ে কও না ছাই!"

"না থাক। আমি সেসব শুনে কী করব।" পতিত বলল।

আপত্তি সত্ত্বেও পতিতের দিকে সরাসরি চোখ তুলে সুজাতা যখন ওর কথা বলতে আরম্ভ করল, পতিত অবাক হয়ে গেল ওর শহুরে মার্জিত ভাষায়।

"শুনুন দাদা, জানি, মেয়েমানুষের এ বড়ো লজ্জার কথা। আপনাকে কতটা বুঝিয়ে বলতে পারব জানি না। তবু সত্য ঘটনাটা আপনার জানা দরকার। বিশেষ, আপনি যখন ওর বাল্যবন্ধু।" বলে, গলায় আটকে-যাওয়া শ্লেষ্মাকে ঢোঁক গিলে, তারপর দু-চোখের দৃষ্টিকে পায়ের দিকে নামিয়ে শুরু করল: "কিশোর আমাকে বহু দিন ধরে খুব বিরক্ত করলেও আমি ওর কথায় কখনো মজিনি। বরং দু-একবার খুব দাবড়েও দিয়েছি, পুলিশে নালিশ জানাব বলে শাঁসিয়েছি। তবু ছেলেটা আমার পিছন ছাড়ত না। বাড়ি থেকে বেরুনোই দায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একদিন আপনার বন্ধু নেশা করে বাড়িতে এসে কিশোরের কথা তুলে মাঝরাতে মারধর করে আমাকে ঘরের থেকেই দিল বের করে, সমস্ত রাত খিড়কি দরজায় পড়ে পড়ে প্রথমে খুব কাঁদলাম, তবু ঘরে নিল না ও। এমনকী, পরদিন সকালে আমার কোনো খোঁজ না নিয়েই দিব্যি সামনের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল যখন, অপমানে অব-হেলায়: দিশাহারা হয়ে গেলাম আমি। ক্রোধে জ্বলে উঠলাম। এক হিংস্র প্রতিশোধের তাড়নায় কিশোরের সঙ্গেই পালালাম। ভেবেছিলাম, ছেলেটা হয়তো সত্যিই ভালোবাসে আমায়। একটা আশ্রয় পাব আমি। কিন্তু এতই ভেরুয়া সে! বাপ-দাদার ভয়ে দু-দিনেই নেশা গেল ছুটে। আমাকে একলা ফেলে পালিয়ে এল। আমিই-বা কী করি তখন। আমার মতো একলা মেয়েমানুষ তিষ্ঠোবে কোথায়। ভাবলাম আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর

নেই। তবু কেন জানি আপনার বন্ধুর জন্য মন কেমন করে উঠল। দেখতে ইচ্ছে হলো খুব। সব লজ্জা-অপমান ভুলে চলে এলাম বাড়ির কাছে। অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু কীভাবে যেন ও দেখে ফেলল আমাকে। ফিরিয়ে নিল ঘরে। বুঝলাম, লোকটা সত্যিই সরল, খুবই ভালোবাসে আমায়। লোকের কানাঘুসো কথায় অমন পাষণ্ড হয়ে উঠেছিল সেদিন। নইলে লোক-অপবাদকে তুচ্ছ করে পরপুরুষের এঁঠো-লাগা আমাকে আবার ফিরিয়ে নেয়? তাই, মরা আর হলো না আমার।"

শুনতে শুনতে পতিতের মনে হলো বিশ শতকের প্রথম দিককার কোনো নভেল পড়ছে যেন। "কী রে বিপিন, শেষমেশ এত ভালো বউটাকে তুই ঘরের থেকে বের করে দিয়েছিলি? ছিঃ!" বলল সে।

"আমি অমানুষ হইয়া গেছলাম ভাই। লোকের কথায় মনের মধ্যে অবিশ্বাস আইছিল। সন্দেহ। মনে হয়েছিল, শরীর নষ্ট হইয়া যাইব, তাই সন্তান চায় না। আমার ভালোবাসার চাইতেও ও নিজের রূপটারেই ভালোবাসে বেশি। শরীর দিয়া ও আমারে ঠকায়। তারপর সেইদিন ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে পাইলাম একখান ট্যাবলেটের পাতা। গেল মাথায় রক্ত চইড়া।"

"কী জানেন দাদা, ওই ওষুধের পাতা বিয়ের পরপর ও-ই এনে খেতে বলেছিল। আমি খাইনি। আমি তো বিয়ের পরপরই মা হতে চেয়েছিলাম। ছোটোবেলা থেকে পুরুষমানুষকে দেখেছি কুকুরের মতো আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে। সক্কলে আমাকে রক্তমাংসের পুতুল মনে করে। আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন শুধুই মাংসের দলা, প্রাণ নেই তার, নেই কোনো হাড়গোড়, কোনো অনুভূতি। তখন থেকে মনকে বুঝিয়েছি বিয়ের পর মা হতে পারলে, সে-জ্বালা জুড়োবে। সমস্ত সর্বনাশের থেকে রেহাই মিলবে।"

"হ, আমিও সেই কথাখান তখন বুঝি নাই রে পতিত। মেয়েমানষেরে বোঝা বড়ো শক্ত।"

"কিন্তু পালিয়ে গিয়ে যে আরও বড়ো সর্বনাশ হলো! কিশোরের মতো বেয়াদব ছোঁড়ার হাতে পড়ার মাশুল তো দিতেই হবে এখন।" পতিতের কথাগুলো পতিতের নিজের কাছেই কেমন সংস্কারাচ্ছন্ন আর অর্বাচীন ঠেকল। কিশোরের সঙ্গে সুজাতার ঘটে-যাওয়া সম্পর্ক কি তাকে ঈর্যান্বিত করে তুলেছে? ছিঃ?

"পালিয়ে গেছ্‌ল বলেই-না জাইনতে পারলাম, সুজাতা বাঁজা নয়, বাঁজা

আসলে আমি।”

“মানে?”

“ওর প্যাটের বাচ্চাডাই তো প্রমাণ।”

পতিত থ মেরে গেল। বলে কী বিপিন? এমনও হতে পারে? চারদিকের এত হানাহানি, লোভ আর হিংসার ভেতরে এই ঔদার্য কি সম্ভব? সময়ের গ্লানির ভিতরেই জন্ম নেয় তিতিক্ষা— এমন এক যুক্তিকে মনে মনে তখন ছকে নিতে চাইল পতিত। তাতে করে একটা ভারসাম্য পেয়ে যায় জটিল যত সম্পর্কের হিসেবনিকেশ। নীতি ও ন্যায্যতা এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে সে পথ খুঁজে পায় তার যুক্তিসত্তার।

“অ্যাখন এই বাচ্চাডারে জন্ম দিবার জইন্য তো সুজাতার, সেইসঙ্গো আমারও খাইয়া-পইরা বাঁচা লাগে পতিত। শালার পোদু হারামজাদা জোঁকের মতো পেছনে লাইগ্গা পড়ছে। দেদার টাকা দিয়া কেলাবের ছেলেগুলানরেও হাত করছে। তুমি পাশে দাঁড়াইলে হরনাথ ভয় পাইব। আমি জানি, হরনাথ এ-পাড়ায় তোরেই সবচে ডরায়। সে জানে, তোরে লোকে মাইন্য করে।” বলল বিপিন।

“হ্যাঁ দাদা। আপনার দুটি পায়ে পড়ি। আমাদের বাঁচান। বাচ্চাটাকে নিয়ে দুইজনে বাকি জীবন একটু আহ্লাদ করে বাঁচি।”

‘আহ্লাদ করে বাঁচি’ কথাটা পতিতকে তোলপাড় করে দিতে থাকে। কী করবে সে? কী করতে পারে? এরা যে তাকে ক্ষমতাবান ভাবছে, আসলে কতটুকুই-বা তার শক্তি? তবু প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ওদের অনুরোধ। মনের গভীর থেকে একটা জোর পায় সে: “আচ্ছা, একটু সময় দাও তোমরা। ভেবে দেখি, কী করলে শায়েস্তা করা যায় হরনাথকে।”

“ভাইব্বা কি হইব কিছু? সকলে মিইলা রুখবার না পাইরলে ও হারামির বাচ্চা একদিন একে একে সব্বার অ্যামোন দশাই করব।”

“জানি। কিন্তু হরনাথের তো পলিটিক্সের জোর। মন্ত্রী-আমলা-পুলিশে ভালো কানেকশন। ভেবেচিন্তে না এগুলে বিপদ বড়ো হয়ে উঠবে।”

“আইচ্ছা। তুই যা ভালো বুঝিস। আইজ যাই।” বিপিনের সঙ্গো সঙ্গো সুজাতাও উঠে দাঁড়ায়।

“যাবি কী! বাইরে তো এখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এই যাঃ! কথায় কথায় ভুলেই গেছি এক্কেবারে। দাঁড়া, তোদের জন্য একটু কড়া করে

আদা দিয়ে চা বানিয়ে আনি।”

পতিতও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তক্ষুনি কারেন্ট এসে টিউবের আলোয় ঘরের ভেতরটা ঝলমলিয়ে ওঠে। সেই আলোর কারণে দাঁড়ানো তিনজনের ত্রিভুজের মধ্যে ছায়ারা ঢুকে পড়ে একটা যোগাযোগ গড়ে তোলে যেন। তিনজনের মুখোমুখি হতে পেরে এতক্ষণে একটা সহজ হাসি পরস্পরের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঘর পেরিয়ে দরজা-জানালার বিস্তৃত পরিসরে।

“না না দাদা, আপনাকে আর কষ্ট করে চা বানাতে হবে না। বৃষ্টিভেজার অভ্যেস যথেষ্টই আছে আমাদের। আপনার বন্ধুর কারবারের দৌলতে আমরা দুই জনেই তো মাছ হয়ে গেছি। ডাঙার চাইতে জলেই আমাদের সোয়াস্তি।”

সুজাতার কথা শুনতে শুনতে পতিতের মনে হলো সে যেন সত্যিই এক মৎস্যকন্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পুচ্ছের মতো দুটি পা ক্রমশ স্ফীত হয়ে কোমর পেরিয়ে স্তনযুগল আর দুই বাহুকে পাখনা করে নিয়ে ঘন চুলের বিনুনিটিকে করে তুলেছে পিঠের শিরার মতো, ভিজে ছাপা শাড়ি শরীরে লেপটে গিয়ে পেয়েছে আঁশের মতো আদল; আর, সেই সিক্ত আঁশের নীচ থেকে ত্বকের উজ্জ্বল মসৃণতা ঠিকরে চর্বি ও মাংসের পেলব সুষমাকে মেলে ধরেছে এমন যে, মনে হবে চারপাশের আলো-কে অঙ্গপ্রত্যঙ্গো শুষে নিয়ে চিক্‌চিক্ চিক্‌চিক্ করছে। এই মাছ কি খাল-বিল-পুকুরে মানায়? এর জন্য চাই নদী, চাই মোহানার দিঘল বিস্তার।

অতঃপর বিপিন আর সুজাতা যেমন বৃষ্টি গায়ে এসেছিল, তেমনই ভিজতে ভিজতে তার চোখের সামনে থেকে রাস্তার উপর দিয়ে মিলিয়ে গেল।

পতিত ভেবেছিল নিতাইদার দোকানে গিয়ে বসবে। চা খেতে খেতে প্রসঙ্গটা নিয়ে আর-পাঁচজনের সঙ্গো একটু শলাপরামর্শ করবে, কিন্তু ভাদ্রের অকালবর্ষণের অজস্র ধারায় তার মধ্যে আলসেমি পেয়ে বসল। তখন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে এ-বই সে-বই ঘেঁটে ঘেঁটে, এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে, রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ-তরঙ্গো ও-তরঙ্গো বিচরণ করতে করতে, এ-গান সে-গান শুনে শুনে কখন একসময় সেই ফেরত-পাওয়া ডায়রির ভেতর থেকে পেয়ে গেল ধূসর ও চটে-যাওয়া সাদা-কালো একখানা ছবি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটাকে দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল ঠাকুমা আর বাবাকে।

কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য একটি অবয়ব এতই অস্পষ্ট যে, অগত্যা তাকে আতশ কাচের সাহায্য নিতে হলো। প্রথমে ভাবল, এ-মানুষটি খুব-সম্ভব ঠাকুরদাদাই হবেন। কিন্তু অনেক সময়ের নিরীক্ষণে হঠাৎই সেই আতশ কাচের ভিতর দিয়ে দেখা খণ্ড খণ্ড অংশ জুড়ে গিয়ে সে ঠাহর পেল হুবহু পাবনের আদল। বা, কমবয়সি পতিতের চেহারার মতো অন্য এক পুরুষমানুষ। ফটোটার সামনের মানুষজনের পিছনে যে-দেয়াল, সেই দেয়ালে ঝুলে রয়েছে আরও একটি ফোটোগ্রাফ। আতশ কাচটিকে সে সেই ছবিটার উপরে নিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে বেমালুম তাজ্জব বনে গেল। সেটি যেন বড়ো ছবিটারই প্রতিরূপ। আশ্চর্য ধাঁধায় পড়ে গেল পতিত। প্রথমত, কে এই তৃতীয় ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, একটি ফ্রেমের মধ্যে কী করে দুটি হুবহু একই ছবির ফোটোগ্রাফ সম্ভব। তৃতীয়ত, আগে কোনোদিন এ-ছবি সে দেখেনি, তবু ডায়রির ভেতর তা এল কীভাবে, পাবন কি খুঁজে-পেতে সংগ্রহ করে রেখেছে তবে? কিন্তু তাই-বা কী করে সম্ভব? সে-ছেলে তো বেশ কয়দিন ধরেই নিপাত্তা। এই পরিবারের ছবি সে কেমন করে পাবে? এতসব জিজ্ঞাসা আর রহস্যের কূলকিনারা না পেয়ে ক্লান্ত পতিত দুপুরের খাবার না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সম্ভবত স্বপ্নই দেখে থাকবে, কারণ দৃশ্যটাকে এখন পতিত ঠিক ঠিক পুনর্নির্মাণ করে তুলতে পারছে না। অনেক অনেক কথার টুকরো, যা দিয়ে যথাযথ পূর্ণ বাক্য বানিয়ে তোলা সম্ভব, তা কিছুতেই সম্পন্ন হবার মতো কাঠামো তৈরি করতে পারছে না। দৃশ্যের ভিতরে যত চরিত্র এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাদের স্বকণ্ঠে সেইসব কথাদের সাজিয়ে তুলেছিল, বরং তাদের মুখগুলোর সঙ্গে শুধু তার এতদিনের পরিচিত মানুষজনের মোটামুটি একটা মিল দেবার আপ্রাণ চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু যেসব কুশীলবের আদলকে কোনো পরিচয় দিতে পারছিল না, তাদেরকে নিয়ে কী করবে? কোন্ চরিত্রায়নে তাদের ভূমিকাকে নির্ধারণ করে নিতে পারবে? অথচ আশ্চর্য এই যে, ওই অচেনা অজানা চরিত্রেরাই তাদের সংলাপগুলোকে নিয়ে এ-মুহূর্তে তার কাছে বেশি স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পতিত ভাবল, স্বপ্নটা কাউকে বলা দরকার। এসময় পাবন ছেলেটা থাকলে ভালো হতো খুব। কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে কি আর ফিরবে কোনোদিন?

"হ্যাঁ হে পতিতপাবন, তোমাকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। এখনও একা একা বসে অঙ্ক-টঙ্ক কষা হয় নাকি?" পতিত দেখল তার মুখোমুখি প্রদীপ স্যার আর জবা। সদরের দরজাটা কি খোলা ছিল তবে?

"কী যে বলেন স্যার! এ-বয়েসে কেউ অঙ্ক মেলায় নাকি?" হেসে উত্তর দিল পতিত।

"কেন? আমি তো এখনও ফাঁক পেলেই সূত্র মিলিয়ে মিলিয়ে অঙ্ক কষি। কী রে জবা, বানিয়ে বলছি?"

"হ্যাঁ, পতিতদা। শুধু নিজে কষা না, সুযোগ পেলে বাজারের সবজিঅলা থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের লোক— সব্বাইকে অঙ্ক শিখিয়ে যাচ্ছেন বাবা।" শাঁখা-পলা নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, এই বয়েসেই জবা কি তবে বিধবা হয়ে গেছে? ভাবল পতিত।

"বুঝলে পতিত, অঙ্কই হলো আন্তর্জাতিক ভাষা, আম জনতার ভাষা, মনের ভাষা। এই ভাষা লিখতে পড়তে ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সাধু-পাপী, ভোগী-ত্যাগী, চোর-পুলিশ— সব্বাই এক হয়ে যায়। পদ্ধতি হয়তো আলাদা, কিন্তু সমাধা একটাই। যেমন দুই যোগ দুই কিংবা দুই ভাগ দুই। সকলে সমস্বরে একই উত্তর বলবে— কেউ কর গুণে, কেউ মনে মনে, কেউ-বা মুখস্থের জোরে। আমার তো মনে হয়, অঙ্কটা ঠিকমতো শিখতে পারলে বা শেখানো গেলে মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ থাকত না। যাক সে-কথা। একটা কষ্ট আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না হে পতিত। মরেও বোধহয় শান্তি পাব না। শত চেষ্টাতেও তোমার ওই অঙ্কটাকে কিছুতে মেলাতে পারলাম না।"

"ওটা নিয়ে আমার আর মাথাব্যথা নেই স্যার। কী হবে এই বয়েসে পুরোনো একটা অঙ্কের সমাধান মিলিয়ে? সব রহস্য প্রকাশ্য হয়ে গেলে মজা যেমন থাকে না, বিস্ময়ের ঘোরও যায় কেটে। ছোটোবেলার বিস্ময়গুলো আজকাল আবার মনের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে বেশ রোম্যান্টিক করে তোলে। এত ভালো লাগে সব কিছু!"

"কথাটা বেশ বলেছে পতিত, না রে জবা? আমি তোকে বলেছি-না

আমার এই এক ছাত্র যে সব কিছুকে নিজের মতো করে ভাবতে পারে। কেমন নিভৃতে, নিঃসঙ্গো, নির্ঝঞ্ঝাটে, কোনো চাকরি-বাকরি না করেই কাটিয়ে দিল এতগুলো বছর।”

“আপনি ঠিক বলছেন না স্যার। এই পক্ষপাতিত্বের জন্যই আপনার সঙ্গো কোনোকালে আমাদের ঠিকঠাক বনিবনা হলো না। জিজ্ঞাসা করুন তো, আপনার এই নির্ঝঞ্ঝাটে অতি পীরিতের ছাত্রটি শুধু-মুদু আমার সব কাজে কাঠি করে কেন? সব ব্যাপারে ওর এত চুদুরবুদুর কীসে?” পতিত দেখল দরজা খোলা পেয়ে হরনাথ ও আরও অনেকেই ঢুকে পড়েছে। আশ্চর্য! বলা নেই কওয়া নেই বাড়িতে চড়াও হয়ে কী চায় এরা? কী?

“হরনাথ না? একইরকম রয়ে গেছ দেখছি। ভালো। তা বাবা, আমরা তো অঙ্ক নিয়ে কথা বলছিলাম, তুমি কি সে-বিষয়ে কিছু বলতে চাইবে? কস্মিনকালে ওসব ব্যাপারে তোমার আগ্রহ ছিল, জানি না তো!”

“এই এক দোষ আপনাদের। মাস্টারি করে করে ভাবেন সব কিছু জানেন-বোঝেন; আর, সুযোগ পেলেই জ্ঞান দিতে শুরু করেন।” হরনাথের বড়ো ছেলে, অমর এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসতে বসতে বলল। “আমার বাবা আপনাদের মতো এ প্লাস বি হোল স্কোয়্যার না জেনেও এ-তল্লাটে যা পয়সা-প্রতিপত্তি করেছে, আপনার আর কোন্ ছাত্র পেরেছে তা? দেশ চালায় কারা? ক-দিন বাদে ইলেকশানে জিতে মন্ত্রী-টন্ত্রী হয়ে গেলে এই আপনারাই তো এটা-ওটা-সেটার ধান্দায় বাবার পিছনে ঘুরঘুর জুড়ে দেবেন। তখন?”

“হ্যাঁ বাবা, ঠিকই তো বলেছেন উনি। তখন অঙ্ক নয়, বিজ্ঞান নয়, এমনকী অর্থনীতি বা দর্শনও নয়, পার্টিই সব কিছুর নিয়ন্তা। পরমেশ্বরের আধুনিক সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।” জবা কেটে কেটে অনেক সময় নিয়ে বলল। ওর ধারালো কথাগুলো শুনতে শুনতে পতিত চমকে উঠল: এই জবা কি সেই জবা, একদিন যে ওর দ্বিগুণ বয়সি একটা লোকের সঙ্গো পালিয়েছিল?

“বাঃ, আপনি তো দেখছি খুব ইনটেলিজেন্ট? সেইসঙ্গো সুন্দরীও।” ইঙ্গিত পরিষ্কার; বয়েসে অন্তত পনেরো-বিশ বছরের ছোটো অমরের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমতী জবা নয়, বরং সুন্দরী জবাই অনেক জ্যান্ত।

“কম বয়েসে দারুণ সুন্দরী ছিল জবা। সেইসঙ্গো একটু বেপরোয়াও।

ওই বয়েসে কোন্-এক মাঝবয়সি লোকের সঙ্গো পালিয়েও গিয়েছিল। তাই না স্যার?” হরনাথের কথায় মাস্টারমশাই লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে পড়েন মোড়ায়।

পতিত উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, “হরনাথ, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ এটা আমার বাড়ি। তোমার আর অমরের কিছু বলার থাকলে, আমাকে বলো। বলে, বিদেয় হও এখান থেকে।”

“আপনাকে একটা কথাই বলতে আসা আমাদের,” বলতে বলতে পিছনের থেকে এগিয়ে আসে কিশোর। ওর পিছনে পিছনে ক্লাবের দু-একটা মাতব্বর ছেলেও, “বিপিন আর তার বউয়ের কোনো ব্যাপারে আপনাকে যেন নাক গলাতে না দেখি। ওদের সঙ্গো ব্যাপারটা আমার পার্সোনাল, আমাকেই মেটাতে দিন।”

“বিষয়টা তো আর পার্সোনাল নেই কিশোর। তুমি বিপিনের বউকে নিয়ে, না কি বউটি তোমাকে নিয়ে পালিয়েছিল, সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। কিন্তু তাই বলে ওদেরকে যদি ভাব সব দিক থেকে কোণঠাসা করে মারবে তোমরা, তাহলে শুনে রাখো, তোমাদের পার্টি-পলিটিক্স নয়, স্রেফ অঙ্ক, হ্যাঁ মাস্টারমশাইয়ের কাছে শেখা অঙ্কের জোর আর জেদেই আমি বিরোধিতা করব তোমাদের।”

“ভালো। কিন্তু পাড়ার ইয়াং ছেলেপুলেদের সঙ্গো কি এঁটে উঠতে পারবে পতিতকাকা? ছেলেছোকরার দল খেপে উঠলে এমন শান্তিতে থাকতে পারবে তো?” অমরের কথার ভেতরের প্রচ্ছন্ন হুমকি বুঝতে কারও অসুবিধা হলো না।

“বাড়ি বয়ে ছেলেটা কাকাবাবুকে অপমান করে যাচ্ছে আর তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখছ?” মেয়েলি কণ্ঠে পতিত চোখ তুলে ভিড়ের মধ্যে হরেনদার ছেলে মৃণাল আর সঞ্চিতাকে দেখতে পেল।

“হ্যাঁ কাকু,” গলার ভিতর দলা পেকে-থাকা জড়তাটুকুকে একটা খাঁকারির সঙ্গো বাইরে উগরে দিয়ে মৃণাল বলল, “আপনার যা ঠিক মনে হয় করুন, আমরা আপনার পাশে আছি। বিপিন আর তার বউয়ের সঙ্গো এরা যা করছে, তা অন্যায়।”

“ঠিক বলেছেন মৃণালদা। আমরাও কাকাবাবুর সঙ্গো আছি।” ভিড়ের থেকে দীপালিদির ছেলে মনোজ বলল।

"আ-হা-হা-হা অমর। কতদিন ধরে পই পই করে শেখাচ্ছি, বয়স্ক মানুষ-জনেদের সম্মান করে কথা বলতে হয়। আজকালকার ছেলেপুলের একদম সহবতশিক্ষা নেই, ধৈর্য তো দূর অস্ত্। হাজার হোক, বয়েসে সামান্য ছোটো হলেও পতিত আমার ছোট্টবেলার বন্ধু। ভুল বুঝেই হোক বা না-বুঝে, আমাদের সমালোচনা ও করতেই পারে; তাই বলে এভাবে বলতে হবে নাকি? ক্ষমা চাও ওর কাছে। এক্ষুনি।" পতিত বুঝল রাজনীতিতে পোড়-খাওয়া হরনাথ অভিনয়টা ভালোই রপ্ত করেছে। ভিড়ের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ মত যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, সেটা আঁচ করেই পোদুর এই ডিগবাজি।

কিন্তু গোঁজামিলের প্যাঁচপেঁচিতে পতিতের কোনো আগ্রহ নেই, সে অঙ্ক-কষার মতো সোজাসাপটাই থাকতে চাইল: "ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই হরনাথ। ভালোই হলো, আমার স্ট্যান্ডটা তুমি জেনে গেলে। স্বয়ং মাস্টারমশাই এবং পাড়ার অন্যান্য মানুষজনও জেনে গেলেন। অন্তত তোমাকে কাঠি করছি, এই অপবাদ ভবিষ্যতে সইতে হবে না।"

পতিতের কথা শেষ হতেই ছেলেপুলেদের ভিতর গুঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেল। দেখা গেল পাড়া ঝেঁটিয়ে নানা মানুষের ভিড়।

"শোনো পতা, পাড়ার সকলেই জানে, বিপিন আর তার বউ থানায় আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। কিন্তু কিশোর আর বিপিনের বউয়ের ঘটনায় আমার কী হাত? পাড়ার সকলের সঙ্গে বসে মিটিয়ে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। আমাকে শুধু-মুদু হেনস্থা করে কী লাভ? কিশোর তো আমার ছেলে না হয়ে অন্য কেউ হতে পারত, তাহলে কি আর আমাকে অপদস্থ করার সুযোগ মিলত? কেউ আমাকে অপমান করলে আমিই-বা তাকে ছেড়ে দেব কেন?" হরনাথের এই কথায় অনেকেই সায় দিল।

মনোতোষদা বলল, "হ্যাঁ পতিত, এইডা কিন্তু বিপিন ঠিক কাম করে নাই। এর জইন্য বিপিন আর তার বউয়ের ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

"উচিতের কথাই যদি বলেন মনোতোষদা, এ-ঘটনায় হরনাথেরও বিপিন-সুজাতার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

"সেটা আলোচনাসাপেক্ষ। আমরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক্ষুনি তো একটা আলোচনা করে নিতে পারি।" মনোতোষদা বলল।

"আপনারা আমার বাড়িতে সালিশি সভা বসাতে চান নাকি?" পতিত অধৈর্য হয়ে উঠল।

"প্রয়োজন হলে তাতে আপত্তি কেন?" হরনাথ বলল।

"না না এটা বাড়ি। ওয়ার্ড অফিস নয়।"

"এই হলো মুশকিল পতা। তোমরা সমস্যার সমাধান চাও না। শুধু ঘোঁট পাকাও।" হরনাথ পতিতকে সকলের সামনে কোণঠাসা করতে চাইল।

"মোটেই না। কালই ক্লাবের ঘরে সভা ডাকা হোক। বিপিন আর তার বউকেও ডেকে নাও। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের নিয়ে কোনো আলোচনা কি ঠিক?" পতিতও হরনাথকে মোক্ষম চাল দিল।

"না না। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। আমরা বিপিনদা আর সুজাতা বউদিকে ডেকে আনছি।" ক্লাবের হোলটাইমার কেস্ট বলল।

"আগামীকাল হলেই-বা কীসের অসুবিধা? সালিশি সভা যখন, পাড়ার সকলের কাছে অন্তত খবর পৌঁছানো উচিত।" মৃণাল বলল।

"কাল আমাদের ক্লাবে কম্পিটিশান আছে। হবে না।"

"তাহলে পরশু হোক।"

তখন মিটিং করা নিয়ে সকলের ভিতর তুমুল বিতণ্ডা শুরু হয়ে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। ক্রমে সেই বিতণ্ডা প্রায় গা-জোয়ারির আকার নিল। শেষপর্যন্ত পতিতের আসবাবগুলোর উপর রোষ গিয়ে পড়ল। লন্ডভন্ড, ভাঙচুর। সেই দিশেহারা অবস্থার মধ্যে, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে জিনস-পরিহিত একটি ছেলে কোথার থেকে উদয় হয়ে হুংকার দিল: "চোপ্।"

ছেলেটার হাতে রিভলবার। আগ্নেয়াস্ত্র দেখে সবাই যে-যার জায়গায় স্থির হয়ে গেল। ছেলেটি হরনাথের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "এই যে পোদুবাবু! বলি, এসবের মানে কী। দেব? রিভলভারের একখানা টোটা পেটের ভেতর ভরে?"

"না না, আমি তো কিছু... মানে আমি তো... আমি তো..."

"কী? আমি তো আমি তো করা হচ্ছে? কার উস্কানিতে এসব গুন্ডামি হচ্ছে বুঝি না ভেবেছ শ্-শা-লা! বিপিন আর তার বউকে খুন করে এখন মিটিং মারাচ্ছ?"

"খু-খু-খু— ন !"

"লোকে জানবে আত্মহত্যা, কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা খুনই।"

বলে কী ছেলেটা? বিপিন আর সুজাতা খুন হয়ে গেছে? পতিত রীতি-মতো হতভম্ব। কিছুই মেলাতে পারছে না সে। কোনো অঙ্ক।

এদিকে আর্তনাদের স্বরে হরনাথ হাত জোড় করে তোতলিয়েই চলেছে, "স-সত্যি ব-বলছি আ-আমি কি-কিচ্ছু জানি না।"

"তুমি জান না, জানে তোমার বাপ? পাড়ার, সমাজের, দেশের-দশের রাজনীতির ঠিকেদারি নিয়েছ, আর এখন জানি না বললে চলবে? জানতে হবে সব, কিন্তু জানাতে হবে অল্প। এর নামই তো পলিটিক্স। কী বলো অমর-চন্দ্র? সোজা অঙ্ক। যোগ আর বিয়োগ। নো গুণ-ভাগ, নো ক্যালকুলাস, নো লিমিট, নো কমপ্লেক্স নাম্বার। এখানে, তোমাদের বাপ-ব্যাটার সঙ্গে কোনো হিসেবনিকেশ করব না। হিসাব হবে পরে। এখন ভালোয় ভালোয় দলবল নিয়ে কেটে পড়ো দেখি। বিপিন আর তার বউয়ের অন্ত্যেষ্টি যাতে ঠিকমতো হয় তার দেখভাল করো গিয়ে। বেশি পুলিশি হুজ্জত না করে তোমাদের দলবলকে দিয়ে দাহ করিয়ে ওর জমিতেই ওদের দু-জনের নামে একখানা বিনে পয়সার চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে ফেলো। ইলেকশনের কাজে লাগবে। বুঝলে?"

পতিত অবাক হয়ে ভাবল: এই মুখ-ঢাকা লোকটা আসলে কোন্ পক্ষে?

"তাই হবে, স্যার।" বলে হরনাথ, অমর, কিশোর ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোর দল বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বাকি সকলেও চলে গেলে পতিত হঠাৎ হেসে উঠল। তার মনে পড়ে গেল হরনাথের মুখ থেকে উচ্চারিত 'স্যার' সম্বোধন। একটা সামান্য আগ্নেয়াস্ত্র কি এতই শক্তি ধরে, যার জোরে অমন দাপুটে হরনাথকেও কিনা কেন্নোর মতো গুটিয়ে যেতে বাধ্য করল ছেলেটা? না কি সমস্ত ঘটনাটা আসলে মুদ্রার অন্য পিঠ, যার চলতি পরিভাষা: গট আপ!

অনেকক্ষণ যাবৎ বিপর্যস্ত, অগোছালো সেই ঘরের ভিতর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর একসময় নিজের ঘরে গেল। পাবন দখল নেবার পর খুবসম্ভব এই দ্বিতীয়বার এ-ঘরে প্রবেশ করল সে। ঢুকেই মনে হলো, মুখ-ঢাকা ছেলেটা পাবন নয় তো? এইভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, প্রকাশ্য থেকে অন্তরালে পাবন কি সব কিছুতে ঘোঁট পাকিয়ে তুলতে চাইছে? যে-কারণে পতিতের অস্তিত্বই বাহুল্য হয়ে যেতে বসেছে? এমনকী তার নিজেরই কাছে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই সে যাচাই করে নিতে পারছে না। অতীত-বর্তমান দুই-ই ক্রমাগত গুলিয়ে যাচ্ছে!

"কী পতিত, অ্যাদ্দিন ছিলা কই? কোথাও গেছিলা-টেছিলা না কি?" নিতাইদা চায়ের গেলাস ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করে।

"কোথায় আর যাব? বাড়িতেই ছিলাম। শরীর ভালো ছিল না, তাই বাড়ি থেকে আর এ-ক'দিন বেরুইনি কোথাও।" পতিত কিছু বানিয়ে কিছু সত্য মিশিয়ে জবাব দেয়।

"এদিকে পাড়ায় তো ঘটনার পর ঘটনা। তাইর খবর রাখ কিছু?" মনোতোষদা চায়ে চুমুক দিতে দিতে পতিতের দিকে তাকায়। সেসব শোনানোর জন্য যেন আর তর সইছে না।

"ঘটনা? কীরকম?" মনোতোষদাকে উৎসাহ দিতেই পতিত কণ্ঠে কৌতূহল মিশিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়। ওকে কথায় উসকে দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে একটা মজা টের পায়। সেই মজাটা অনেক সময় ধরে পতিতের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে একটা মকটেল বানিয়ে তোলে। সুস্বাদু রসাল।

"সেদিন বাজারের কাছে পুকুরপাড়ে পইড়া-থাকা পাশাপাশি দুইখান লাশের কথা মনে আছে তোমার? তাগো লইয়া তো এখন নানা জনে নানান কথা কয়। ছাওয়ালটারে নাকি অনেকে বেশ কিছুকাল ধইরা এই তল্লাটের আশপাশে ঘুরঘুর কইরতে দেখছিল, আর তার লগে নাকি তোমার যৈবন-কালের চেহারার খুব মিল। একইরকম গোঁফ-দাঁড়ি, চুলগুলান পেছনের দিকে শোয়ানো, টিকোলো নাক, জোড়া ভুরু আর ছোটো ছোটো দুইখান চক্ষু।"

বর্ণনা শুনে পতিত নিজের অল্পবয়েসের চেহারার ছবি মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। বাড়ির আলমারিতে রাখা অ্যালবামের ভিতর থেকে একটা পুরোনো ছবির আভাস সামান্য চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে-ছবিটা ঠিক তার যৌবনের নয়, বরং কৈশোরের। হঠাৎ যেন আবিষ্কারই করে ফেলল সে, সত্যি তো, যুবাবয়েসের কোনো ছবিই নেই তার! নিজের চেহারার পরিবর্তন টের পেতে পারে এমন কোনো ফটো নেই যে, মনোতোষ-দার বর্ণনার সঙ্গে তা ঝালিয়ে নিতে পারে!

"সেরকম মিল খুইজা পাওয়া নতুন কথা না। আসলে মিল দেয়া হইল মাইনষের স্বভাব।" মনোতোষদাকে থামিয়ে দিয়ে নিতাইদা বলল।

"কিন্তু মাইয়াটারেও যে লোকে কয় দেইখতে অনেকখানি পলির মতো, সেইডাও মনগড়া কইবা?"

"মনগড়া কি না কইতে পারি না, তবে তারে দেইখ্খা আমিও কম চমকাই নাই। এক্কেরে পলি। ওই মেয়েটার যা বয়েস হেই বয়েসেই তো পলিরা আপনাগো বাড়িখান বেইচাবুইচা কোথায় চইলা গেল। সত্যি, পষ্ট যেন দেখলাম তারে। লাশ হইয়া শুইয়া আছে। কী হে পতিত! দেখছিলা কি লাশখান?"

"না। তবে সেটাও তো একরকম মিল খোঁজা নিতাইদা। পলিদি যদি আজও বেঁচেবর্তে থাকে তবে তার বয়েস তো আর থেমে নেই। সেই মেয়ে যে পলিদি না, এর থেকে বড়ো প্রমাণ আর কিছু আছে কি?"

"আঃ হা পতিত! পলি না হইলেও তার মাইয়া হওনে দোষ কোথায়?" মনোতোষদা বেশ জোরের সঙ্গে বলল। "পলির লগে তো আমার কয়েকবার দেখা হইছে। তার এক স্বামীও আছে। মাইয়া থাকা তো বিচিত্তির না।"

"আপনি পলিদির হালহকিকত কিছু জানেন না কি?" জিজ্ঞাসা করে পতিত।

পলিদির সেই অনুক্ত কথাগুলো তাকে ইদানীং কেন যে তাড়িয়ে বেড়ায়! খুব জানতে ইচ্ছে করে আউট্রামঘাটের বেঞ্চিতে বসে কী কথা বলবে বলে শেষমেশ হঠাৎ বৃষ্টির কারণে তা বলে উঠতে পারেনি পলিদি। বিশেষত পাবনের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সে বুঝে উঠতে পারে না, একটা হারিয়ে-যাওয়া সম্পর্ক কেন তার জীবনে এতদিন পরে বিস্মৃতির বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে।

"ঠিক কইতে পারি না। কারণ তার লগে তেমন কথা কওনের সুযোগ হয় নাই। প্রতিবারই ভিড়ের ভেতরে মেট্রোরেলে দেখা। সেইথিকা মনে হয়, হয়তো মেট্রো স্টেশনের সংলগ্ন কোনো জায়গায় বাসা হইব তার। কিন্তু সে-খোঁজে তোমার কী কাম?" মনোতোষদা বলল।

"এমনিই। মনে হলো ওই মরা মেয়েটা যদি পলিদিরই সন্তান, তবে কেন সে পুলিশের কাছে গিয়ে লাশের স্বত্ব দাবি করেনি?"

"হয়তো মাইয়াডা ঠিক সুবিধার না। তাছাড়া পলিও তো তোমাদের কম না। পুলিশের চক্করে পইড়া যদি সব খোল্সা হইয়া যায়— তাই হয়তো—"

"এ আপনার বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনোতোষদা। আগেও দেখেছি,

পলিদির সম্পর্কে কেচ্ছা রটনা আপনার ভালো লাগে।" পতিত সামান্য উষ্মা প্রকাশ করেই কথাটা বলল।

"কেচ্ছা রটনার কী আছে? বাপের বয়সি পুরুষের লগে ঢলাঢলি কইরা ঘর ছাড়ল, এমনকী ঘর বেইচ্চাও দিল। এই সেদিনও যখন দেখা হইল, দেখি সাজের ঘটা কী! পাশে-বসা এক পুরুষের লগে কী মশকরা! মাইয়া হইয়া পুরুষমাইনষের সিটে বসা ক্যান রে বাপু? এইসব মাইয়াছেলে চিনতে ভুল হয় না আমার।"

"তাই বুঝি? আপনার লগেও কি মাখামাখি করছিল পলি? না কি আপনারও একটু ইয়ে ইয়ে হয়েছিল?" নিতাইদা পতিতের দিকে চোখ টিপে বলল। নিতাইদার প্রশ্নের ঢঙে কোণে-বসা অচেনা খদ্দেরও না হেসে পারল না।

"ভদ্দরলোকের লগে মশকরা কর নাকি নেতাই? অ্যাদ্দিন ধইরা পাড়ায় আছি, আমারে দেখ্‌ছ নাকি কোনোদিন কোনো ইয়ার্কি দিতে? দেখতাছি, তোমার দোকানে আর আসা যাইব না।" বলে, দুম করে মনোতোষদা চায়ের পয়সা ঠকাং করে টেবিলের উপর ফেলে হুটমুট করে হাঁটা লাগাল। কাণ্ড দেখে পুরো দোকান সমস্বরে হেসে উঠল।

"বুঝলে পতিত, সইত্য কথাডা কইলাম কিনা, তাই মন্‌তোষ ভট্‌চায্যির সহ্য হইল না। ডাগর মাইয়া দেইখলে এই বয়েসেও হালায় যেভাবে তাকায় মনে হইব চুইষ্যা চুইষ্যা খাইব। কিশোর তো ছোকরা পোলাপান, বিপিনের বউডারে সেও কম উত্ত্যক্ত করতে বাকি রাখসে না কি? বয়স্ক মানুষ, সাহস কম, জোরও কম। নাইলে সে-ও হয়তো লইয়া পলাইত। বেচারা বিপিন! মাছের কারবারির কি আর সুন্দরীরে বিয়া করা চলে? নিজে তো মরলিই, অমন বউডারেও মারলি।"

"মানে?" পতিত অবাক হয়ে তাকাল।

"ক্যান, ঢং কর? য্যানো কিছুছুটি জান না!"

"কী জানব শুনি?"

"বিপিন যে তার বউডারে মাইরা নিজেও ফলিডল খাইয়া মরছে, শোনো নাই?"

"বল কি নিতাইদা? কবে?"

"কিশোরের পেছনে লাগছিল। তা তার পোদ্দার বাপে ছাইড়ব ক্যান?

পেরথমে বিপিনের ব্যাবসাডারে লাটে পাঠাইল। তারপর তার ঘরে একদিন মাতাল বদমাশ ঢুকাইয়া বউডারে দিল বাজে অপবাদ।"

"পাড়ার কেউ কিচ্ছু করল না?"

"কানাকানি আর ফিসফাস ছাড়া কে কী করব শুনি? তুমিই-বা ছিলা কই? থাইকলেও কিছু করবার মুরোদ আছে তোমার? পোদ্দার তো এইবার শুনি তার পার্টি থিক্যা এমএলএ-র টিকিট পাইব। যেভাবে টাকা ছড়াইতাছে, ছোকরা পোলাপানদের হাত কইরা ফ্যালছে, তাইতে অ্যাখনি য্যান ইলেক্শান জিইত্তাই গ্যাছে। বিপিন আর বিপিনের বউ তার নামে থানায় নালিশ করছিল, সুইসাইড নোট লিইখ্খা গেছিল; সেসব হাপিশ হইয়া গেছে। মন্ত্রী-দারোগা সবই য্যান তার ভায়রা ভাই। বুঝলা না? তার বিরুদ্ধে লড়ব কেডা? মাজায় জোর আছে?"

"কিন্তু এখন যে তুমি সকলের সামনে হরনাথের নামে এত গালমন্দ করছ, ভয় হচ্ছে না?"

"কোথায় সক্কলে, কই তো শুধু তোমারে। আর যাই হোক, তোমারে পোদু বিশ্বাস করে না।"

পতিত দেখল সত্যি দোকান একেবারে জনশূন্য।

মনে মনে দুটো ঘটনার পারম্পর্য কিছুতেই মেলাতে পারছিল না পতিত—বাজারের পুকুরের ধারে পাওয়া যুবক-যুবতীর লাশ এবং বিপিন ও সুজাতার আত্মহনন। সেইসঙ্গে আরও দুটি ব্যাপার কেবলই ওই দুটি ঘটনার সঙ্গে জুড়ে তার চিন্তাভাবনাকে আতান্তরে নিয়ে ফেলছিল: পাবনের অন্তর্ধান এবং জবাসহ প্রদীপ স্যারের আবির্ভাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোকে বলে, সারাদিন ধরে অলস সময় কাটানো ছাড়া কোনোই কামকাজ নেই পতিতের। কিন্তু পতিত অনুভব করে প্রত্যহ ঘুমের থেকে জেগে কীভাবে ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে সমস্ত দিন কেটে সন্ধ্যা, এবং সন্ধ্যের পর নেমে আসে রাত, আর তারপর আবারও সে ঘুমিয়েই পড়ে। কত কাজ তার অসমাপ্ত থেকে যায়। তবে কি যে-কাজে অর্থাগম নেই, উপার্জন নেই, সে-কাজের কোনো হিসাবনিকাশও নেই? উৎপাদন-সম্পর্ক ছাড়া শ্রম হলো প্রবৃত্তি মাত্র? অথচ তা হবে কেন? তার মা-ঠাকুমা তো চাকরি-বাকরি করেননি কস্মিনকালে, হাজারো সংসারের কাজেই কাটিয়ে দিয়েছেন গোটা জীবন, ছেলেপুলে বেশি ছিল তাও নয়; তবু তাদের বেলায় তো লোকে অমন কথা বলে না? তবে কি সে পুরুষমানুষ বলেই লোকে অমন বলা-কওয়া করে? সকাল থেকে উঠে বিছানা-তোলা, বাজার-করা, নিজের কাপড়চোপড় কাচা, বই-গোছানো, বই-পড়া, কখনো-বা ইচ্ছে হলে চা করা, পাড়াপ্রতিবেশী এলে চা দিয়ে আপ্যায়ন জানানো, তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো, দীপালিদি কামাই দিলে এমনকী রান্নাবান্না করাও— এসব কাজ নয়? বাগানের গাছগুলোর নিয়মিত যত্ন-আত্তি, মালি ডেকে তার সঙ্গে হাত লাগিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দু-একটা মরসুমি সবজি ফলানোও কি কাজ নয়?

কখনো কখনো নিজেকে বাহুল্য বা অপ্রয়োজনীয় যে মনে হয় না, তা নয়। জীবন কীরকম হলে বেঁচে-থাকাটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সেটা সে বুঝে উঠতে পারে না, আর তা পারে না বলেই ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে। সেই ক্লান্তি কাটাতেই কখনো-বা ঘরবাড়ি বা এই পরিচিত পাড়ার গণ্ডি পার করে বেরিয়ে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে; নিজের পরিচিত চৌহদ্দি ছেড়ে চার-পাঁচ মাইল দূরের কোনো অপরিচিত বাজারের বা চা-দোকানের উদ্দেশে। সে দেখে কত নতুন বাজার, কত নতুন নতুন চায়ের দোকান, নতুন বাড়ি, নতুন নতুন বসতি, নতুন মানুষ। সেইসব অপরিচিত মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে পতিত বাজার করে, চা খায়, তাদের গল্পগাছা শোনে। অজ্ঞাত পরিচয় সেইসব

মানুষজনের ভাষা, হাসি, কষ্ট, রাগ, ঘেন্নার অংশভাক হয়ে তার ক্লান্ত মন স্বস্তি পায়। যেন পেয়ে যায় পুনরুজ্জীবনের আহ্লাদ। এই-যে অভ্যস্ত জনজীবন ছেড়ে অন্য-এক অচিন জনপদে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মানানসই করে নিতে চায় সে, তা কি শুধু ক্লান্তি থেকে পালানোর জন্যই? না কি নিজেকে সময়োপযোগী, গোষ্ঠীভুক্ত করে তোলার অক্ষমতাই তাকে এরকম দলছুট, শ্রেণিচ্যুত করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়?

ওই-যে লোকটি উবু হয়ে বসে গভীর মনোনিবেশে বেছে বেছে আলু তুলছে ঝুড়িতে, তারপর দোকানির সঙ্গে ওজন আর দরদাম নিয়ে কথাকাটাকাটি, তারও পরে পাশের সবজিঅলার থেকে বেগুন বা সিম কিনতে গিয়ে দরদাম শুনে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থনীতি নিয়ে সরকারের এক প্রস্থ বাপ-বাপান্ত শেষ করে অম্লানবদনে মোড়ের চা-দোকানে বসে চা আর বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে ধর্ম-রাজনীতি-জোট-ভোট নিয়ে জুড়ে দিচ্ছে আলোচনা; পতিত সেসবের কিছু কিছু শোনে, কিছু-বা আবার শুনতেও পায় না, কারণ, ততক্ষণে তার দৃষ্টি ও মন চলে গেছে ওই কুঁজো বুড়িটার দিকে, যার পিছন পিছন পাড়ার যত চ্যাংড়া ছেলেপুলে খ্যাপাতে খ্যাপাতে চলেছে; বুড়ি একবার পিছন ফিরে তার শতচ্ছিন্ন শাড়িটাকে বুকের থেকে খসিয়ে ডান পা জমিতে আছড়াতে আছড়াতে "হারামির বাচ্চা, সাত খানকির এক খানকি যত বেজন্মার দল, কী দেখবার চাস? এই মাই দু-খান? ক্যান, জন্মাবার পর মায়ে দুধ দ্যায় নাই তোগোরে?" বলতে বলতে শাড়িটা আবার বুকে তুলে ধীর পদক্ষেপে পেরিয়ে যেতে থাকে বাজারটাকে, আর, চারপাশের ছেলে ও বুড়োর দল মজা পেয়ে হোহো হাহা হিহি হাসিতে বুঁদ—এইসব, এমনই নিত্যদিনের খণ্ড খণ্ড যাপনের পতিতও তো একজন, তবু ওই লোকটা বা অন্য অনেকের মতো সে হতে পারে না। তার কোনো প্রেম নেই, আসক্তি নেই; নেই হুল্লোড় করার মতো বন্ধুবাৎসল্য। এই চা-দোকানে বসে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে শুধু সময়ের অর্থ খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে সূর্য যখন আলো ও উত্তাপকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে, পতিত ফিরে আসে বাড়ি; বিছানায় শরীর এলিয়ে ঘুমিয়েই পড়ে। ঘুমের স্বস্তি তাকে ভুলিয়ে দেয় সময়ের অঙ্ক, প্রত্যহের হিসেবনিকেশ।

"পতিতদা ! ও পতিতদা, এই অবেলায় ঘুমাও নাকি পড়ে পড়ে?" পতিত চেয়ে দেখে, পাবন তার পায়ের কাছে বসে।

"বলা নেই, কওয়া নেই এতদিন কোথায় উধাও ছিলে শুনি?" পতিত আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করে। আশ্চর্য! ছেলেটার অবর্তমানে যতই আকথা-কুকথা মনে হোক-না-কেন, কাছে এলে কেমন মোলায়েম হয়ে যায় পতিত।

"সে অনেক কাজ। ধীরে-সুস্থে বলা যাবে নাহয়। কিন্তু এর মধ্যে কাজের কাজ একটা করে এসেছি।"

"কী?"

"তোমার পছন্দসই কাজের জোগাড় হয়েছে।"

"কী কাজ?"

"লেখকের ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে সংশোধন আর কপি করার কাজ।"

"আমি করব লেখকের লেখার সংশোধন? কী যে আবোলতাবোল বল তুমি পাবন!"

"তুমি বোধহয় জান না, অনেক লেখকের হাতের লেখা উদ্ধার করায় যেমন যথেষ্ট জ্ঞানগম্যির দরকার হয়, তেমন অনেক বানান সংশোধনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার পরিচিত এক নামকরা প্রকাশক শিক্ষিত কপি-এডিটর খুঁজছিলেন, যে বাংলা ইংরেজি দুটো ভাষাই জানে। আমি তোমার কথা বলতেই রাজি হয়ে গেলেন।"

"না না ওসব কপি এডিটিং আমার দ্বারা হবে না। পরের লেখা নকল করে লাভ কী?"

"কেন? তুমি কি নিজেই কিছু লিখবে ভেবেছ?"

"ঠিক তা নয়। কিন্তু, যদি কপি আর সংশোধন করতে গিয়ে বেখেয়ালে নিজের কথা ঢুকে পড়ে?"

"পড়বে। তাতে তো লেখকেরই লাভ। একজন লেখকের সারা বছর যে-পরিমাণ লেখার বহর তাতে কি মনে থাকার জো আছে, কী লিখেছিলেন তিনি? মূল কাহিনি আর ভাষা অটুট থাকলেই হলো। বাক্য সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যদি লেখাটা ভালো হয় লেখক তো তাতে খুশিই হবেন।"

"ধুত। জেরক্স রাখেন না বুঝি? আজকাল তো আবার অনেক লেখক কম্পিউটারে লিখে থাকেন।"

"আশ্চর্য, জবাবদিহি তো করবে প্রকাশক, তোমার অত মাথাব্যথা কীসের? সব লেখকই যদি ভালো সম্পাদক হবেন তাহলে প্রকাশক কপি-এডিটর খুঁজবে কেন?"

"এ তোমার লেখকদের প্রতি অবজ্ঞার কথা হলো। নামিদামি লেখকদের মতো একখানা লিখে দেখাও তো দেখি ! ওদের খাটুনি, ওদের জনপ্রিয়তাকে কি অবজ্ঞা করতে পার ?"

"আচ্ছা তর্ক জুড়লে তো তুমি পতিতদা ! কাজ না করার ফিকির খোঁজো খালি। যশ বা জনপ্রিয়তায় তোমার কী আসে যায় ? তোমার কাজ তো কেবল প্রকাশকের হাতে ছাপাই-কপিটি তুলে দেয়া।"

"কেরানির মতো কোনো কাজ করতে ভাল্লাগে না আমার। ও আমি পারব না।"

"কিন্তু দাদা, কাজটা যে তোমাকে করতেই হবে। আমি প্রকাশককে কথা দিয়ে এসেছি। একখানা ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়েও এসেছি সঙ্গে করে।"

"বটতলার লেখা নয় তো ? দেখি !" কী মনে করে সামান্য আগ্রহ দেখাল পতিত।

পাবন একটা খামের ভিতর থেকে জীর্ণ, শতচ্ছিন্ন কাগজের গুচ্ছ বের করে এগিয়ে ধরল। পতিত সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখল, অনেক লেখাই অনতিস্পষ্ট এবং জায়গায় জায়গায় কাগজ ছিঁড়ে গিয়ে তার পাঠোদ্ধার প্রায় দুঃসাধ্যই নয় শুধু, যথেস্ট শ্রমসাপেক্ষও। তবু এরই মধ্যে দু-একটি লাইনের ভিতর চোখ গিয়ে লেখার কিছুটা পাঠ সম্পন্ন হতে পারল। রচনার ভাষা ও চলন তাকে তার ডায়রির লেখাগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

"লেখকের নামটা কী ?" মুখ তুলে পাবনকে জিজ্ঞাসা করল সে।

"মেহক শাণ্ডিল্য।" জবাব দিল পাবন।

"ছদ্মনাম ?"

"তাই তো মনে হয়। কারণ শাণ্ডিল্য তো হিন্দু গোত্র। পদবি হয় বলে জানা নেই।"

"হ্যাঁ। নামটাও অদ্ভুত ! মেহক। উর্দু শব্দ। অর্থ বোধহয় সুবাস। কোন্ লেখকের ছদ্মনাম, জান তুমি ?"

"এক্কেবারেই না। ওসব প্রকাশকের ব্যাপার। আমার জেনে হবেটা কী শুনি ? তাছাড়া আমার কাছে কাজটাই বড়ো। নামটা নয়।"

"আগ্রহ হয় না ? কাজ করব কিন্তু জানতে চাইব না তার স্রষ্টাকে ? জানব না কী করছি, কেন করছি, কার জন্য করছি, কেমনই-বা সে-কাজ ?"

"এইজন্যই তোমার কিছু হলো না পতিতদা। এত ভাবলে পরিশ্রমের ইচ্ছা কমে যায়, অগোছালো হয়ে পড়ে আসলটাই, উলটে যত উদ্ভট বিষয় প্রধান হয়ে কাজকেই পণ্ড করে দেয়।"

"তুমি দেখছি একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং, নীরস তরুবরে কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু জেনো, শুষ্কং কাষ্ঠং শুধু জ্বালানি হয়ে নিঃশেষিত হবার প্রতীক্ষায় থাকে, নীরস তরুবর সেখানে কুঁড়ে ঘরের দড়মা হয়ে ঘরের সৌন্দর্যই বাড়িয়ে তোলে না মাত্র, যেন সরসতা পেয়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।"

"আরিব্বাস ! তুমি তো দেখছি লেখক হতে পারতে দাদা। বেশ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পার।"

"বানিয়ে কথা বলতে পারলেই কেউ লেখক হয় না। লেখা দর্শন, পরিশ্রম আর মনস্বিতায় হয়।" বলে, কিছুক্ষণ চুপ থেকে পতিত যেন স্বগতোক্তি করল, "তুমি ম্যানুস্ক্রিপ্টটা রেখে যাও। দেখি, কিছু করে উঠতে পারি কি না।"

"এই তো চাই !" উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পাবন। তারপর বসবার আসন থেকে উঠে, ঘরের ভিতর সামান্য পায়চারি করে নিয়ে ফের আসনে বসতে বসতে বলল, "আর-একটা কথা ছিল পতিতদা। একটি মেয়েকে তোমার এখেনে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় দিতে হবে।"

শুনে আকাশ থেকে পড়ল পতিত। মেয়েমানুষ ? "না না। তা হয় না কক্ষনো। বাড়িটাকে কি তুমি হোটেল বা বোর্ডিং ঠাউরেছ, যাকে-তাকে এনে তুলবে ?"

"আমি যে তাকে কথা দিয়ে ফেলেছি দাদা। প্লিজ—"

"আশ্চর্য ! কথায় কথায় তোমার এই কথা দিয়ে ফেলার ঝোঁক কেন বলবে ? তাও সেটা যদি নিজের ব্যাপারে হতো। আমার বিষয়ে তোমাকে কে ফোপরদালালি করতে বলেছে ? দেখছি, শেষমেশ আমাকে তুমি এ-বাড়ি থেকে বিদেয় করেই ছাড়বে। পাড়ার প্রমোটার-মাস্তানদের সাথে তোমার কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

"ছিছি, একজন মেয়েমানুষ বিপদে পড়ে আশ্রয়ভিক্ষা চাইছে, তার সঙ্গে তুমি প্রমোটারি কারবার জুড়ে দিলে ?"

"একজন মেয়েমানুষ কখন কোনো পুরুষের আশ্রয় চায় ? ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ছাড়া কি সম্ভব সেটা? তুমি বরং মেয়েটিকে বিয়ে করে নিজের কোনো ডেরায় নিয়ে তুললেই পার। আমার এখানে কেন? না না, সে হবে না। কোনোমতেই না।" প্রবলভাবে আপত্তি জানাল পতিত।

পাবনের মুখখানা কেমন কিছুক্ষণ আগের সতেজতা হারিয়ে পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে, তারপর গড়িয়ে গড়িয়েই হয়তো-বা খাটের নীচু দিকের বিছানার প্রান্তে হেলে পড়ল। তখন আপনমনে ম্যানুস্ক্রিপ্টের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎই আবিষ্কার করল পতিত, একটা বইপোকা সচকিত ভয়ের থেকে যেন ড্রাগনের গতি পেয়ে বিছানায় নেমে দৌড়ে পাবনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। পোকাটাকে খপ করে ধরে ফেলল পতিত এবং তারপর কী করবে বুঝতে না পেরে ম্যানুস্ক্রিপ্টের খোলা পাতার উপরেই ফের ছেড়ে দিল। অদ্ভুত, পোকাটা এবার আর ত্রস্ত হয়ে নয়, বরং ধীরে-সুস্থে একটা ছিদ্র আবিষ্কার করে সেঁধিয়ে গেল তার ভিতরে। পতিত তখন উন্মুক্ত সেই পাতার লেখাতে মনোনিবেশ করে পোকাদের তৈরি অসংখ্য সব ছিদ্রের বাধা এড়িয়ে এবং লেখার অস্পষ্ট অংশগুলো পুনর্নির্মাণ করতে করতে দেখতেই পেল না পাবন কখন বিছানার থেকে নেমে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

সম্বিৎ ফেরার আগে ম্যানুস্ক্রিপ্টের কতগুলি পৃষ্ঠা পড়ে উঠতে পেরেছিল পতিত। তখন মনে হলো, ইশ্ এতক্ষণ যদি সে পঠিত অংশের এডিটিংটাও সেরে ফেলত তবে কত কাজ এগিয়ে যেত তার! হ্যাঁ, লেখা পড়তে পড়তে কখন যেন সে মনঃস্থির করে নিয়েছে, পাবনের দেয়া এই কাজটা করবে সে। লেখার মধ্যে এমন-এক আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা, দৃঢ়-মোলায়েম গঠন, প্রাকৃত-তৎসমের টানাপোড়েন, ঋজু-বঙ্কিম চলন আছে যে, পতিতের মনে হলো এমন লেখার সম্পাদনায় সে হয়তো স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতার আনন্দ পেতে পারবে। শুরু থেকে ফের পড়তে শুরু করে দিল সেই পাণ্ডুলিপি। সেইসঙ্গে এডিটিংয়ের কাজও।

নিবিষ্ট সে-চরাচর হতে, প্রাচীন মন্দিরগাত্রের মতো একখানি মৃত্তিকানির্মিত দ্বিতল বাড়ির খিড়কি-জানালার খিলান সহসা উন্মুক্ত হয়ে একগুচ্ছ ঘন কেশমণ্ডিত মুখ ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয়েই পুনরায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ইলিয়াস কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল সামনের অশ্বত্থবৃক্ষ হতে চ্যুতপত্রের মর্মর, সে কি বাতাসেরই দীর্ঘশ্বাস, না কি

শীতশুরুর ইঙ্গিত? বায়ুপ্রবাহ কোন্ দিকে প্রবাহিত সেই অনুসন্ধিৎসায় সে পদতলের জমি হতে সামান্য তৃণ ছিন্ন করে নিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে পরখ করতে চাইল। কিন্তু আশ্চর্য এই, পরমুহূর্তে একটি এবং একটিই মাত্র দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের বাতাসে ভেসে ভেসে চলার দৃশ্যে ইলিয়াস এতটাই বিস্রস্ত ও ভ্যাবাচ্যাকা বনে গেল যে, তার মনে পড়ে গেল এক বর্ষারাত্রের শেষপ্রহরে আম্মির চলে-যাওয়ার কথা। তার আম্মির রূপ ছিল সাক্ষাৎ দুগ্‌গা পিতিমের মতো। ইলিয়াসের বয়েস যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দিকে, যখন কোনো কোনো মধ্যরাতে যৌনসংসর্গেচ্ছার উচ্ছল স্বপ্নেরা এসে তার ঘুমের অন্দরে অদ্ভুত আনন্দ আর উত্তেজক অনুভূতির রেশকে থিতু করে তুলত, তখন তার বিলক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আব্বু আম্মির রূপের দহন সইতে না পেরেই একদিন জিন হয়ে চলে গিয়েছিল রুহ্-র সন্ধানে। রুহ্-ই যে রূপারূপের অতীত! আব্বুর অন্তর্ধানের পরে ইলিয়াস দেখেছে আম্মি কোনো কোনো দিন গভীর রাত্রে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাড়ির পেছনের অন্ধকার বাঁশবন লাগোয়া পুষ্করিণীটির শান-বাঁধানো চাতালে আব্বুর জিনের সঙ্গে বসে বসে বকর বকর আর বকম বকম করে। আব্বুর জিন আম্মির দিঘল চুলের ভিতর থেকে কত বিচিত্রের রেশম উড়িয়ে দিত বাতাসে; সেগুলো ভাসতে ভাসতে পাড়ি দিত আকাশে। তারপর আম্মি যখন ফিরে আসত, ইলিয়াস দেখতে পেত, আলুলায়িত আম্মির স্খলিত বস্ত্রখণ্ড পতাকার মতো উড়তে উড়তে দেহাংশের সঙ্গে ছেঁড়া-ছেঁড়া লেপটে ছোপ ছোপ সাদা-সাদা কালো-কালো, সাদা আর কালো গাভীর মতো মন্থর পদচারণায় এগিয়ে আসছে তার পানে। সেই দৃশ্যে চোখে তার ঘুম-ঘুম বিভোর লেগে আসত। টের পেত আম্মি এসে আলতো করে তার মাথায় বুলিয়ে দিত হাত।

একদিন সেই আম্মিও তাকে ফেলে রেখে চলে যাবার পর এই পৃথিবীতে ইলিয়াস যারপরনাই একলা হয়ে গেল। এরপরে আব্বুর জিনকেও আর কখনো দেখতে পায়নি সে।

ইলিয়াস অবশেষে (কিংবা নিরুপায়), বা ইতস্তত অর্থহীন পদ-চারণায় কখন অশ্বত্থ গাছটির সীমা অতিক্রমকরত সেই মন্দিরসদৃশ গৃহটির নিকটবর্তী হয়ে অনেকক্ষণ মুক্ত গবাক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মুদ্রাদোষে দাঁত দিয়ে নখের প্রান্ত কেটে চলল। আশ্চর্য, সেই

প্রতীক্ষামুহূর্তে (কিন্তু কীসের প্রতীক্ষা? কার জন্য?) তার চিন্তারা ক্রমে উবে গিয়েছিল এবং কোনোদিন আর সে সেই অতিবাহিত সময়ের সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা কিছুই স্মরণে আনতে পারে না। তবু, মানুষের প্রতীক্ষার অসংখ্য মুহূর্তগুলি তো তাদের আয়ুর নিরবচ্ছিন্ন অংশই বটে। এসময়ে, এই পড়ন্ত বিকেলের কুয়াশাবিষ্ট সঘন মুহূর্তকালে, আকাশে একটি দলছুট সারসের ক্রম-অপস্রিয়মাণ দৃশ্যাবহের পশ্চাৎপটে সম্মুখস্থ গৃহের কপাটখানি উন্মুক্ত হয়ে চকিতে নির্গত হয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। "কে আপুনি? কী চাই?" প্রশ্নের ভিতরে বৃদ্ধার অসহিষ্ণুতা না কৌতূহল প্রকাশ পেল, বুঝতে পারল না ইলিয়াস।

"আজ্ঞে, আমি শামসুজ্জামান, সাকিন জামতোড়া।"

ইলিয়াসের উত্তরে বুড়ি বলল, "আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল। দুই নম্বর প্রশ্নের জবাব পাই নাই।"

"না, মানে... আমি কিছু চাইতে আসিনি, আপনার বাড়িটা দেখে খুব ভাল্লাগলো কিনা, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি।"

"বাড়িখান আমার না। দেবোত্তর সম্পত্তি। আমি আর আমার মাইয়া জমিদারের থিক্কা থাকবার পাইছি। ভিতরখান দেখবার চাও যদি, হইব না, কারণ তুমি মোসলমানের পোলা।"

"আজ্ঞে।"

"অবেলায় ঘুইরা বেড়াও, কামকাজ কিছু কর না বুঝি?"

"করি। জমিজমার দেখভাল। আমার তো কেউ নেই। সারাবছরের জমির ফসলেই একার পেট চ'লে আরও কিছু বেঁচে যায়। সেসব বিক্রিবাট্টা করে দুটো পয়সাও আয় হয়।"

"অ। ভালো। আমি অ্যাহন অন্দরে যাই। তুমি আইসো। ক্যামোন?"

"আজ্ঞে।" ইলিয়াস দেখল, বৃদ্ধা তার অকস্মাৎ প্রবেশের মতোই নিমেষে সেই কপাটের ভিতর দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের গবাক্ষ সশব্দে বন্ধ হয়ে ঝুপ্ করে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। নিবিষ্ট চরাচর আরও গহিন নিবেশে যেন প্রাচীন কোনো ধ্বংসাবশেষের স্তূপচিহ্নের সীমাকে ভেঙে দিয়ে দিগন্তপ্রসার ছায়াগর্ভে বিলীয়মান হতে হতে পশ্চিমাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলের মতোই মাথার উপর প্রস্ফুটিত নিশ্চল হয়ে রয়েছে। অনেক অনেক সময় পরে কুয়াশাক্ষীণ আস্তরণে সে আরও দেখতে পেল একটা মাদীঘোড়ার

পিঠে সওয়ার হয়ে ধূসরবর্ণ একটি জিন ক্রমশই দূরে সরে যেতে যেতে দৃষ্টিশক্তির সামনে থেকে ক্রমে বিলীন হয়ে মিশে যাচ্ছে দিগন্তরেখায়।

পড়তে পড়তে পতিত মূল কপি থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনা করে একটা বাঁধানো খাতায় লিখে নিচ্ছিল। এই পর্যন্ত এসে নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। সামান্য জিরিয়ে নিতে চাইল সে। তখন ম্যানুস্ক্রিপ্টের পাতাগুলোকে সযত্নে গুছিয়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ মনে হলো দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে।

"কে?" জানতে চাইল পতিত।

"আমি মলি। দিন ওগুলো আমার হাতে। ঠিক ঠিক গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি।"

পতিতের হাত থেকে ম্যানুস্ক্রিপ্টের পাতাগুলো অগোছালো হয়ে খসে পড়ল। শিহরন না বিহ্বলতা, ঠিক কী পরিভাষায় যে পতিতের পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া সম্ভব, কে জানে! এ যে পলিদিকেই দেখছে সে! সেই চোখ, সেই নাক, সেই ভুরু, কপাল, ঠোঁটে-লেগে-থাকা মৃদু হাসি, সেই ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রংটা শুধু পলিদির তুলনায় চাপা। ম্যানুস্ক্রিপ্টের ছড়ানো পাতাগুলো মেয়েটি সামান্য ঝুঁকে যখন একটা একটা করে তুলে রাখছিল তখন হাত ও আঙুলের ব্যবহার তার সামনে পলিদিকে যেন আরও জ্যান্ত করে তুলল। সে স্পষ্ট অনুভব করল সেতারের তারের ওপর দিয়ে সেই আঙুলগুলো চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। পতিতের মুখ থেকে আপনিই প্রশ্নটা ফের উচ্চারিত হলো: "কে তুমি?"

" এই-যে বললাম আপনাকে— মলি—"

"কিন্তু এখানে কী করে?"

"আশ্রয়ের খোঁজে। ও বলেনি আপনাকে?"

"পাবন? পাবনের সঙ্গে এসেছ তুমি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ও কি আপনাকে কিছুই বলেনি?"

"বলেছিল। কিন্তু আমি তো নিষেধ করেছিলাম।"

"তা-ই? পাবন তো ভারি অসভ্য। আমাকে আপনার আপত্তির কথা কিছুই জানায়নি। ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।"

"না, আমি ঠিক ওভাবে বলিনি। তুমি বুঝবে নিশ্চই... কোনো পরিচয়

নেই... তাছাড়া তোমাদেরই-বা সম্পর্ক কী যে, এখানে থাকতে দেব আমি? লোকে বলবে কী?"

"কী বলবে?"

"লোকের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম, আমিই জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে, তোমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কী। তোমরা বিবাহিত?"

"না।"

"তাহলে?"

"কিন্তু আমাদের সম্পর্ক বিয়ের থেকেও বেশি।"

"ভাই-বোন ছাড়া দু-জন প্রায় সম প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ের থেকে বড়ো সম্পর্ক কী হতে পারে?"

"বিয়ে কি জরুরি খুব? পরস্পরের মানসিক সম্মতি আর সহিষ্ণুতা কি কিছ্ছু নয়?"

"সেসব নানাজনের সঙ্গেই হতে পারে কিন্তু বিয়েটা শুধু সম্মতি বা সহিষ্ণুতাই নয়, সেটা এক অচ্ছেদ্য টান। শরীর আর মনের যূথবদ্ধতা। স্বামী-স্ত্রী কাকে বলে বোঝো কি তোমরা?"

"সংস্কার বা অভ্যাসের বেশি কিছু কী? "

"ভুল। ও হলো বইয়ের শেখানো বস্তাপচা বুলি। একই আশ্রয়ে একসঙ্গে বছরের পর বছর যাপন বড়ো সহজ কথা নয়।"

"আপনি কি ভালোবাসা মিন করতে চাইছেন?"

"ধুস, ভালোবাসা তো ইউটোপিয়া। কবিকল্পনা।"

"নাঃ, আপনার কথাবার্তার কোনো মাথামুন্ডু নেই। স্ববিরোধে ভরা। আপনি তো বিয়ে-থা করেননি, স্বামী-স্ত্রী, প্রেম— এসবের আপনি কী বুঝবেন?"

"বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম। বুঝি না ওসব। কিন্তু তোমাদের উভয়কে এ-বাড়িতে ঠাঁই দিতে আমার মন সম্মত নয়! ডাকো পাবনকে।"

পাবন কাছেপিঠেই ছিল। আড়াল থেকে শুনছিল সব কথা। মলিকে তাই আর ডাকতে হলো না। নিজেই প্রবেশ করল ঘরে।

"শোনো পাবন, তুমি মলিকে নিয়ে এখুনি চলে যাও। প্লিজ, জোর কোরো না আমার সঙ্গে, তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হব।"

"না না, সেসবের দরকার নেই দাদা, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।" বলে,

মলি পাবনের হাত ধরে টান লাগাল, "চলো পাবন।"

ওরা বেরিয়ে যেতেই পতিত সদর দরজা তালাবন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দিষ্টের মতো। পুরো ঘটনাটা তাকে উথালপাথাল করে যেন ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে এক অজানা-অচেনার দিকে। সমস্ত পরিচয় ও স্বচ্ছন্দের গন্ডি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ভয়ের দিকে। উঃ, চারিদিকে এত ভয় কেন?

"কোথায় যাও পতিতদা? সেই তখন থেকে লক্ষ করছি তুমি একই রাস্তায় চরকিপাকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ!" পতিতের সামনে রোগাভোগা চেহারার, তামাটে রং, হাতে-পায়ে শ্রীহীন এক স্ত্রীলোক। তাকে চিনল কীভাবে?

"কে আপনি?" জানতে চাইল পতিত। সামান্য বিরক্তিই মিশেছিল তার গলায়। কেননা সেসময় কোনো চেনাজনের সান্নিধ্য পেতে চাইছিল না সে।

"চেনা যাচ্ছে না, তাই না? স্বাভাবিক, কেউই আর আজকাল চিনতে পারে না জবাকে।"

"তুই জবা? সত্যি, এ কী শরীরের হাল হয়েছে রে তোর!"

"আগে তুমি বলো, কেন এমন হারা নিরুদ্দিষ্টের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ?"

"কই না তো! বাড়িতে মন টিকছিল না, তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম হয়তো। কিন্তু তুই! এ কী চেহারা করেছিস নিজের? স্যারের খবর কী?"

"বাবা আর নেই।" বলে চোখ নামিয়ে নিল জবা।

জবার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে পতিত দেখতে পেল সার বেঁধে একদল ডেঁয়ো কালো পিঁপড়ে চলেছে। কোথায় চলেছে ওরা? প্রশ্নটা মনে করিয়ে দিল শৈশবে কত কত দিন পিঁপড়ের দলের যাত্রাপথ অনুসরণ করতে করতে পৌঁছে যেত সে কখনো কোনো মাটির গর্তে, কখনো-বা গাছের কোটরে। এখন সেই ইচ্ছের তাগিদেই কি না কে জানে, দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে দেখে নিতে চাইল ওদের গন্তব্য। দেখল পথের ধারের একটি বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দলটির অভিযান বিস্তার পেয়ে চলে গেছে অন্দরে। জবা তার কথা ফের শুরু করাতে পিঁপড়ের দলকে ছেড়ে পতিতের মনোযোগ ফিরে এল নিজেদের বৃত্তের ভিতরে।

"বাবা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আমি যেন একটা চিঠি তোমার কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করার জোর হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।"

"কেন?"

"সে অনেক কাহিনি। শুনে কাজ নেই। বরং দেখা যখন হয়েইছে তখন চিঠিটা তুমি নিয়েই যাও। ওই চায়ের দোকানে গিয়ে মিনিট দশেক অপেক্ষা করো, আমি বাসা থেকে এনে দিচ্ছি সেটা।"

"কেন, তোর বাসায় যেতে কি বাধা আছে কোনো?"

"বাধা নেই তবে আপত্তি আছে। সেই কুচ্ছিত জায়গা সহ্য হবে না তোমার।"

"সহ্য না হয় পালিয়ে আসব, তবু আপত্তি করিস না। নিয়ে চল আমাকে। একা একা প্রতীক্ষা ভালো লাগে না আমার।"

"বেশ চলো। কিন্তু কথা দাও, করুণা দেখাবে না কোনো।"

"দিলাম। আর বেশি না বকে চল তো এগিয়ে।" কপট ধমকে উঠল পতিত।

জবার বাসায় যাওয়া থেকে শুরু করে জবার মুখ থেকে শোনা ওর জীবনের ঘটনার কথা পতিত সেই রাতে ডায়রিতে লিখে রেখে দিয়েছিল। কেন লিখেছিল? সচরাচর নিজেকেই তো সে লিখে রাখে ডায়রির পাতায়। কিন্তু জবার কথা আলাদা করে লিখতে গেল কেন? তবে কি মনে মনে নির্মিত হতে থাকা সময়ের কনফেসন তাকে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিল এইসব?

প্রদীপ স্যারের ছোটো মেয়ে জবার এমন পরিণতি ভেবে শিউরে উঠতে হয়। জবার কাহিনি লিখে রাখতে গিয়ে আমি যেন সমস্ত জোর হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে কী দরকার এইসব লিপিবদ্ধ করে রাখার? তবু, প্রায় জবারই জবানিতে, লিখে রাখতে চাইছি সেই কাহিনি— যেভাবে একজন সংবাদ পরিবেশক কাগজের পাতায় ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, জবা কী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে পেরেছিল আমাকে।

স্বামী আর ছেলের সামনেই কালো কাপড়ে মুখ-ঢাকা ছেলেগুলো একে একে ধর্ষণ করে জবাকে। তারপর ওরা ওকে নিয়ে গিয়ে রাখে এক গোপন আস্তানায়। সেখানে দিনের পর দিন পালা করে করে রেপ করে যেত নানা বয়েসের পুরুষ। এই অত্যাচারে জবা মরেই যেতে পারত। কিন্তু মরল না। নিষ্কৃতি পাবার অদম্য বাসনায় স্বেচ্ছায় পাগল সাজল ও। শরীরের পোশাক খসিয়ে উলঙ্গ হয়ে আবোলতাবোল বকতে শুরু করে দিল। ধর্ষক পুরুষগুলোর গায়ে হিসি করে দিত, আঁচড়ে-কামড়ে,

থুতু ছিটিয়ে ওদের অতিষ্ঠ করে তুলত। তবু লোকগুলো ওর হাত-পা বেঁধে কখনো যৌনদ্বারে, কখনো গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দিত যৌনাঙ্গ। শেষে একদিন যখন একজনের কান কামড়ে রক্ত বের করে সেই রক্ত চেটে চেটে খেতে শুরু করল, লোকটা ভাবল বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে জবা। প্রবল আঘাতে ওকে অজ্ঞান করে দিয়ে পালাল লোকটা। দলের অন্যরা তখন এক নির্জন জায়গায় ওকে ফেলে রেখে চলে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছেয় জবা নিজেকে এরপর যথার্থই পাগল বানিয়ে ফেলল। পথে পথে ঘুরে এর-ওর থেকে খাবার চেয়ে স্টেশনচত্বরে, বাজারের ভিতর কিংবা কোনো বাড়ির উঠোনে রাত কাটিয়ে দিতে দিতে তবু বাঁচতে চাইল জবা। খুব ছোটোবেলায় চোখের সামনে মাকে মরে যেতে দেখার পর থেকেই মৃত্যুকে বড়ো ভয় ওর। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ফের চলে এল এই মফস্‌সল শহরের কাছাকাছি। কেন? সে কি পুরোনোকে আঁকড়ে ধরতে? স্মৃতিরা কি কেবলই শৈশবের পরিক্রমণে ফিরে যেতে প্রাণিত করে?

পরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেত পথে-ঘাটে। কেউ কেউ ভিক্ষাও দিত, কিন্তু চিনতে পারত না। একদিন পথচলতি হঠাৎ স্যারের সামনে পড়ে গেল। ভেবেছিল বাবাও পারবেন না চিনতে। কিন্তু নিদারুণ ভুল হয়ে গেল ওর। চিনে ফেললেন তিনি। তারপর যে-ক'দিন বেঁচে ছিলেন, জবার কাছেই থেকেছেন। পুলিশ-কোর্টকাছারি করতে চেয়েছিলেন স্যার, জবাই রাজি হয়নি। পুলিশের কাছে গেলে সাহায্যের চেয়ে হেনস্থার সম্ভাবনাই যে বেশি, সেই শঙ্কায়। তাছাড়া পুলিশকে বলা মানেই তো রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া সব। একদিন জবার কারণে ঘরদোর চাকরি-বাকরি খোয়াতে হয়েছে শিক্ষক বাবাকে। এখন যদি মানসম্ভ্রমও বিসর্জন দিতে হয়, সেটা জবার কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। বরং সামান্য যে-ক'টা দিন বেঁচে ছিলেন স্যার, পেনশন আর তাঁর টিউশনের টাকায় মেয়ে-বাপে সুখেই দিন কাটছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর জবাকে আয়ার কাজে যুক্ত হতে হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে সামান্য রোজগারের কারণে উঠে আসতে হয়েছে এই বস্তিতে। এখন এই জীর্ণ লাবণ্যহীন শরীরটাই ওর মস্ত অ্যাডভান্টেজ। আয়ার কাজ পেতে কোনো অসুবিধা তো হয়ই না, মাঝেমধ্যে কোনো কোনো দয়ালু মানুষজনের কাছ থেকে ভালো বখশিশও পেয়ে যায়।

এরই ফাঁকে আমাকে চা করে দিয়ে জবা ঘরের কোণে-রাখা একটা ভাঙাচোরা সুটকেসের ভেতর থেকে মাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা বের করে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। চিঠিটা দিতে দিতে জবা বলেছিল, "প্লিজ পতিতদা, এটা তুমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পোড়ো। আমি চাই না আমার সামনে বসে পড়ো, কেননা ওটা চুরি করে পড়ার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। আমি পড়েছি জেনে বাবা রাগ করেছিলেন খুব। এও জানি, চিঠি পড়ার পর তুমিও আমার উপর রেগে উঠবে কিংবা ভর্ৎসনাই করে বসবে। তোমাকে কথাটা বেমালুম গোপন রাখতে পারতাম আমি, কিন্তু কেন জানি এই ছোট্ট স্বীকারোক্তিতে মনের থেকে একটা ভারী বোঝা নেবে গেল, আমি আজ যেন অনেক স্বস্তি পেয়ে গেলাম। কথা দিচ্ছি, তৃতীয় কেউ চিঠির কোনো কথা আমাকে মেরে ফেললেও জানতে পারবে না।"

এরপর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে অথবা, কথার প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন এক বিষণ্ণতায় আমি চিঠিটাকে পকেটস্থ করে সেই বস্তির থেকে বেরিয়ে পড়ি।

একটা কথার উল্লেখ না করলে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাড়ি ফিরে সব কিছু ওলটপালট করে, জামা-প্যান্টের পকেট তন্ন তন্ন খুঁজেও চিঠিটাকে কিছুতেই আর পাচ্ছি না কোথাও। আশ্চর্য! গেল কোথায় সেটা?

৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

ম্যানুস্ক্রিপ্ট সংশোধনের কাজ বারো আনাই এগিয়ে গিয়েছে। সে-লেখা পড়তে পড়তে পতিতের মনে হয়েছে এমনটা সে কখনো পড়েনি। অবশ্য এও ঠিক, বিশ্বসাহিত্যের কতটুকুই-বা পড়েছে সে। পুরো রচনাটার মধ্যে একটা আলগা উদাসীনতার ছাপ স্পষ্ট, তবু অদ্ভুত এক লিখনশৈলী তাকে এই কাজে দারুণ আনন্দ দিয়ে চলেছে। যেমন ধরা যাক এই অংশটুকু:

সন্ধ্যে হয়-হয় আন্ধারে বৃদ্ধা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলেছে কোথায়? ইলিয়াস কি পিছু নিয়ে দেখবে? কিন্তু যদি টের পেয়ে যায় বুড়ি? তবু অনুসরণ করার বাসনা থেকে ইলিয়াস নিজেকে নিরত করতে পারে না। ইদানীং প্রায়শ সে এই ভগ্নজর্জর বাড়িটির চারপাশে ঘুরঘুর করে। বৃদ্ধার মেয়েকে কেন জানি খুব দেখবার সাধ হয়। বৃদ্ধাকে মনে হয় রূপকথার সেই রাক্ষুসি বুড়ি, যে রাজকন্যেকে মায়ায় গুণ করে আটক রেখেছে বন্দিশালায়।

যেতে যেতে বুড়ি হঠাৎ কেন জানি থমকে দাঁড়াল। ইলিয়াসও। ভাবল, বুড়ি কি টের পেল? ফিরে যাবে নাকি ইত্যবসরে বাড়িটার ভিতরে? গিয়ে রাজকন্যেকে উদ্ধার করে পালাবে বহু দূরে, যেদিকে দু-চোখ যায়— রূপকথার গল্পে যেভাবে রাজকুমার উদ্ধার করে আনে বন্দিনী রাজকন্যেকে। কিন্তু সেই মেয়ে যদি তার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে? জিজ্ঞাসা করে বসে কোথায় তার পক্ষিরাজ ঘোড়া? কোন্ দেশের রাজপুত্র সে? কী প্রত্যুত্তর দেবে? অগত্যা বুড়িকে অনুসরণ করাটাই মনস্থ করে সে। বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে শাল-তমাল-বট-বাবলা-অশ্বত্থ-হিজল-কাঁঠাল-নিম ইত্যাদি তরুরাজি সমৃদ্ধ বনানীর অভ্যন্তরের একটি মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে সে পৌঁছাল এক শীর্ণ জলতোয়ার পাড়ে। চমকিত হয়ে ইলিয়াস দেখতে পেল কোত্থেকে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দিঘল অশ্বের পিঠে চরে এক সওয়ারি ন্যুব্জ হয়ে বৃদ্ধাকে তুলে নিল তার সামনের আসনে। তারপর দুদ্দাড় নদীকে পেরিয়ে মিলিয়ে গেল ওপারের জঙ্গলে। ইলিয়াসও তখন অনুসরণপূর্বক অশ্বখুর হতে নির্গত জলীয় বাষ্পের ধোঁয়ার বুক চিরে সবেগে লাগাল ছুট। ছুটতে ছুটতে বনানীর আবছায়ে কখনো সে এই

দেখে ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে যুগল আরোহীকে, কখনো আবার কোথায় ঘোড়সওয়ার, এ-যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শুধু, চারপাশে জোনাকির ঝিকমিক আলো। তবু দৌড়ে চলল ইলিয়াস। চলতে চলতে শেষে এক কুয়াশাবৃত প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল আরোহীহীন অশ্বটি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় নামিয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। সে অশ্বের নিকটস্থ হয়ে ক্ষণিক দাঁড়াল। চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল ঘোড়াটি তার দিকে আগুয়ান হয়ে গণ্ডদেশ এগিয়ে দিল, যেন কতদিন তার কোনো সোহাগ জোটেনি। আহা! ইলিয়াস মায়াভরে তার স্নেহার্দ করতলের স্পর্শে আলতো আদর বুলিয়ে দিতে থাকল ওর গলদেশে। তারপর একসময় কী মনে হতে চড়ে বসল কিংখাবে, রেকাবে গলিয়ে দিল ধূলিমাখা পা দুটিকে; আর তৎক্ষণাৎ তীরবেগে বনভূমি, নদী, প্রান্তর পেরিয়ে অশ্বটি তাকে কখন যে এনে ফেলল সেই ভগ্ন-জীর্ণ বাড়িটির দরোজায়, মালুমই হলো না তার। ইলিয়াস তখন অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণপূর্বক সন্তর্পণে এগিয়ে গেল দরোজার দিকে: সামান্য ঠেলায় উন্মুক্ত হয়ে এল কপাট। সশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করল গৃহাভ্যন্তরে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দ্বিতলে। দেখল কৌণিক দূরত্বে অবস্থিত একটি কক্ষ হতে মৃদু আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে চতুষ্পার্শকে ভরিয়ে তুলেছে যেন মায়াবী রৈখিকে, কমলা রঙের আবরণে। সাবধানি পদক্ষেপে সে পৌঁছে গেল সেই কক্ষের সামনে। সেখানে প্রবেশ করে সচকিত হয়ে লক্ষ করল পালঙ্কে শয়নরত এক যুবতী। যুবতী কি নিদ্রিত? নিজের প্রশ্নে নিজেই চমকে উঠল ইলিয়াস। নিকটে আগুয়ান হয়ে সেই মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছে। যুবতী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আরও গভীরভাবে সে পর্যবেক্ষণ করতে চাইল ওকে। এ কী! স্খলিত পোশাকের ভাঁজে এ-যে নগ্ন ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রায়; নাভি হতে স্তনযুগলে বিস্তৃত গভীর এক ক্ষতচিহ্নে রক্তের আভা! ভয়ে-বিহ্বলে পিছিয়ে এল সে। তারপর গভীরতর মমতার টানে ফের এগিয়ে গেল শয্যাপার্শ্বে, কোন্-এক অমোঘ আকর্ষণে তার ডান করতল রাখল ক্ষতের উপরে; আর তক্ষুনি জেগে উঠল মেয়েটি। ইলিয়াস দেখল কোথায় স্খলিত বসন, শরীর জুড়ে ঝলমলাচ্ছে স্বর্ণচরি শাড়ি। ইলিয়াসের দিকে সকরুণ দৃষ্টি ফেলে মেয়েটি বলল: "এতদিনে সময় হলো তবে! যাও, এখুনি চলে যাও এখান থেকে।"

"চলে যাব?" স্বগতোক্তির মতো বলল ইলিয়াস।

"হ্যাঁ। কেন এসেছ লুকিয়ে লুকিয়ে? কাপুরুষ তুমি।"

"উপায় ছিল না।" ইলিয়াসের কথাগুলো যেন ঠিক তার নয়, অন্য কারও। সে শুধু উচ্চারণ করে চলেছে।

"দুর্বলই দেয় উপায়ের অজুহাত।" মেয়েটি দুই করতলে মুখ ঢেকে, বুঝি অশ্রুকে আড়াল করতে, বক্ষদেশে নামিয়ে আনল চিবুকের অগ্রভাগ।

"বিশ্বাস করো আমাকে। নিরুপায় পালিয়েছি নিজের থেকে, তোমার থেকে নয়।" নিজের উচ্চারিত কথা নিজের কানেই বিশ্বাস হচ্ছিল না ইলিয়াসের।

"হায় বিশ্বাসঘাতক! নিজেকে লুকোনো মুখোশের আড়ালে।"

মেয়েটির ভর্ৎসনা ইলিয়াসকে অপরাধী করে তুলেছে যেন। সে আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল: "তবু একটি বার যদি ধরো আমার হাত, এক্ষুনি তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারি।"

"পারবে না। ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত এ-শরীর গলে-পচে এই বাড়িটারই মতো খসে খসে পড়ছে। দেখো।"

ইলিয়াস দেখল, রাজকন্যা তার পোশাক খসিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য। রক্ত আর পুঁজের জ্বলন্ত অঙ্গার! আতঙ্কে চক্ষু বুজে এল তার।

"সহ্য হলো না তো রাজা! যাও, চলে যাও। করুণা কোরো না। সইবে না তা।"

রাজা? ইলিয়াস চমকে উঠল সম্ভাষণে। তারপর এগিয়ে গেল ওর কাছে। দুই হাত প্রসারিত করে। ঠিক তক্ষণই শুনতে পেল কাদের কণ্ঠস্বর; ক্রমশই এগিয়ে আসছে গৃহাভিমুখে। সভয়ে পিছিয়ে এল সে, কাল-বিলম্ব না করে দুদ্দাড় সিঁড়ি বেয়ে দরজা সবেগে ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর ছুট ছুট ছুট ছুট ছুট... শুধুই ছুটে চলেছে শামসুজ্জামান... পালিয়ে ভিটে, মাটি, লোকালয়ের দূরে...

এডিটিং করতে করতে অবাক হয়ে ভাবছিল পতিত, আশ্চর্য এমন লেখক কিনা এতকাল সাহিত্যজগতের আড়ালেই থেকে গেলেন! কত লেখা হয়তো-বা নষ্টই হয়ে গেছে তাঁর। লেখকের অবহেলাই কি শুধুমাত্র দায়ী?

না কি কোথাও কোনো অভিমান তাঁকে করে তুলেছিল একান্ত উদাসীন? পতিত আরোই অবাক হয়েছিল যখন তার মনে পড়ে গিয়েছিল লেখাটির এই অংশের সঙ্গে ছোটোবেলায় ঠাকুমার কাছে শোনা গল্পর আশ্চর্য মিলের কথা!

[ঠাকুমা কি এই পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন? মেহক শাণ্ডিল্যকে জানতেন?]

তখন ঠাকুমার কাছে শোনা সেই গল্পের অংশ জুড়ে আগেভাগেই পতিত সম্পন্ন করে নিতে চাইল মেহক শাণ্ডিল্যের কাহিনিটিকে। কিন্তু ঝাপসা হয়ে গেল সেই স্মরণের চেষ্টা। শুধু, গল্প বলতে বলতে ঠাকুমার মুখের অভি-ব্যক্তিটুকুই তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল। গল্প বলার সময় ঠাকুমা নানা ধরনের স্বগতোক্তি করতেন, সেইসব স্বগতোক্তিগুলো পতিতের বানিয়ে-তোলা কাহিনির সঙ্গে মিশে ঘুলিয়ে দিতে চাইল পতিতের স্মৃতিকেই। ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকল সমস্ত ঘটনা আর চরিত্রর বর্ণনা। গল্পটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগল।

কাহিনি নির্মাণের বৃথা চেষ্টার থেকে বাধ্য হয়ে তাই সরে এল পতিত। অতীত থেকে বর্তমানে। কল্পনা থেকে সজ্ঞানে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

মলির সঙ্গে পাবন সেই-যে চলে গেল, আর এ-মুখো হবার নাম নেই। এদিকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট সংশোধনের কাজ একপ্রকার শেষ। প্রতীক্ষা করতে করতে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে পতিত। স্ক্রিপ্টটা নিয়ে যে কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না। সামান্য যেটুকু বাকি রয়ে গেছে তাকে শেষ করে ফেলার তাগিদও হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। এ-ক'দিন এমনকী বাড়ির বাহিরমুখো পর্যন্ত হয়নি। দীপালিদির ছেলে মনোজকে দিয়েই বাইরের যত কাজ করিয়ে নিয়েছে। নাঃ, এভাবে আর অপেক্ষার মানে হয় না কোনো। কতদিন খবরের কাগজ পড়া হয়নি। দেশ ও বিশ্বের খবরাখবর জানার বাসনা পর্যন্ত হয়নি। এমনিতে রান্নাবান্নার ফাঁকে, দীপালিদি নানান কথা বকবক করতে ভালোবাসে খুব, কিন্তু সম্ভবত পতিতের হাবেভাবে সেও আজকাল আশ্চর্য নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। পতিত বেশি অবাক হলো এই ভেবে, সত্যি তো! এ-ক'দিন কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি সে! আজ তাই ঠিক করল, বেরিয়েই পড়বে। যেদিকে মন চায়। অনেকদিন নিতাইদার দোকানেও যাওয়া হয়নি। সর্বপ্রথম সেখানে গিয়ে পাড়ার হালহকিকত জেনে নেবে, তারপর শহরে যাবার বাস ধরে একটু এদিক-ওদিক চরকি দিয়ে আসবে। জয়ার কাছেও যাওয়া যায়। যদিও স্যারের চিঠিটা ফেলে আসেনি তবু অন্যমনস্কে যদি ঘটেও থাকে তা, তবে হয়তো পুনরুদ্ধার হবার একটা ক্ষীণ সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। আবার বইপাড়ায় গিয়ে এক-আধটা বইও কিনে আনা যেতে পারে। কত দিন নতুন কোনো বই পড়া হয়নি তার। ইশ্‌ !

নিতাইদার দোকানে ঢুকতেই সকলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। সকলে বলতে নিতাইদাকে নিয়ে সাকুল্যে চারজন। বাকিরা— হরনাথ পোদ্দার, মনোতোষদা আর ক্লাবের হোলটাইমার কাম কেয়ারটেকার কেষ্টা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা যেকোনো সময় কেষ্টাকে পাওয়া যাবেই।

বরফশীতল নীরবতা ভেঙে নিতাইদাই প্রথম মুখ খুলল। "হ্যাঁ হে পতিত, তোমার বাসায় ইদানীং রেতবিরেতে নাকি মেলা লোকের আনাগোনা! পুলিশে নানা সন্দেহ করে। কাইল তো তোমার বাসার আশপাশ দিয়া বেশ

কয়বার টহল দিয়াও গেছে। সক্কলে দ্যাখছে। ব্যাপারখান কী, কও তো শুনি!"

পতিত মনে মনে হিসাব কষে দেখল অন্তত মাস খানেক পাবন নিপাত্তা। বলল, "কই, কেউ তো আসেনি নিতাইদা! পুলিশে হয়তো অন্য কোনো কাজে এসে থাকবে। হরনাথের কাছেও এসে থাকতে পারে। পুলিশমহলে ওর তো প্রচুর জানাশোনা।"

"এই তো হরনাথ বইস্‌সা আছে। হেই তো আমাগো পুলিশের সন্দেহের কথাখান কইল। কী হরনাথ, তুমিই কও-না এতক্ষণ ধইরা যা কইতাছিলা।"

"হ্যাঁ পতিত, পুলিশ কাল আমাকে তোমার ব্যাপারে নানা কিছু জিজ্ঞাসা করছিল।" নিতাইদার কথার পিঠে বলল হরনাথ। এর মধ্যে ক্লাবের পল্টন, বিশু, ভোলা ও আরও কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলেপুলে এসে ভিড় জমিয়েছে দোকানে। সকলে হাঁ করে কথা গিলছে ওদের।

"কী নানা কিছু?" পতিত হরনাথের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জানতে চাইল।

"তুমি কী করো, বাজারের পুকুরধারে যেদিন দুটি ছেলেমেয়ের লাশ পাওয়া গেছিল তার আগে-পরে তোমাকে দেখেছি কি না, তোমার বাড়িতে ইদানীং কারা কারা আসে— এইসব আর কী।"

"কী জবাব দিলে তুমি?"

"কী আবার, যা সত্যি তাই বললাম।"

"সত্যিটা কী শুনি!"

"তুমি কি উকিল যে এত জেরা করতে লেগেছ?"

"সত্যি জানার জন্য কি উকিল হবার প্রয়োজন হরনাথ?"

"যদি কয়াই থাকে যে, তুমি পাড়ার লোকেদের লগে খুব বেশি মিলামিশা কর না, অথচ কোনো গোলমেলে ব্যাপার দেইখলেই তাইতে ঢুইক্কা পড়ো, আর মানুষজনরে খ্যাপাইয়া বেড়াও— হেইডা কি ভুল?" মনোতোষদা এমন করে বলল যেন হরনাথ কোনো সালিশি সভা বসিয়েছে, আর ও সেই সভায় হাজির হয়েছে সাক্ষী দিতে।

মনোতোষদার কথার থেকে সারবস্তু টেনে নিয়ে পতিত হাসতে হাসতে হরনাথকে তার বাল্যকালের তুকারি সম্বোধনে বিঁধে বলল, "কী রে পোদু, ইলেকশান ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে নাকি! টিকিট তাহলে পেয়ে গেছিস।"

হরনাথ রাগত ও বিব্রত হয়ে উঠলেও মুখে কিছু বলল না।

ক্লাবের ছেলেরা হঠাৎ উৎসাহ দেখিয়ে স্লোগান দিয়ে উঠল: "কাছের মানুষ কাজের মানুষ হর্-নাথ্ পোদ্-দার্ জিন্দা-বাদ্!" "জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!"

পতিতের তখন সন্দেহ হলো, হরনাথই আসলে পেছনে পুলিশ লেলিয়ে, আর গালগল্প ফেঁদে এলাকার লোকেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে তাকে। পোদু কি তবে সত্যিই ভয় পায় পতিতকে? বিপিন ঠিকই বুঝেছিল? কিন্তু ওর মতো পাওয়ারফুল লোক ভয় পেতে যাবে কেন? হঠাৎ হাসি পেল পতিতের। সেই হাসিটাকে ঠোঁটের কোণে সুকৌশলে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাঃ দারুণ খবর! নিতাইদা, পোদুর এই অনারে আমার নামে সকলকে জম্পেশ করে চা আর টোস্ট বিস্কুট খাইয়ে দাও দেখি। যতই হোক ও আমার প্রতিবেশী। কম গর্বের কথা?" হরনাথের নামে স্লোগান দিতে শুনে পতিত যেন খুব মজা পেয়েছে আর সেই মজাটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাইছে। হরনাথের দিকে ঘুরে জানতে চাইল: "এম.এল.এ. না এম.পি. "

"ধুস! মিউনিসিপ্যালটি।" হরনাথ একটু চুপসে গিয়ে জবাব দিল।

"তবে চেয়ারম্যান হইব হর্‌নাথই, এমন কথা পাক্কা হইয়া গেছে।" মনোতোষদা বলল।

"জিতলে কী করবি?" প্রশ্ন করল পতিত।

"কেন? উন্নয়ন।" 'উন্নয়ন' কথাটা কেষ্টা এমনভাবে বলল যেন কোনো কমপিটিটিভ পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। একটাই এবং অবশ্যম্ভাবী যার উত্তর। অন্য কোনো চয়েসের প্রশ্নই ওঠে না।

"সে তো সব ক্যান্ডিডেটই বলে। কিন্তু স্পেসিফিক কিছু আছে কী?" বলল পতিত।

"আলবাত আছে। এই এলাকা জুড়ে যে-খাল রয়েছে তার সংস্কারই হবে আমার প্রথম কাজ। এম.এল.এ. সাহেবের সঙ্গো অলরেডি একপ্রস্থ কথা হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলার মতো আবার খালে নৌকা চলবে। তখন দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এই খালে নৌকোবিহার করতে আসবে। দু-পাড় দিয়ে সার সার গাছ আর ল্যাম্পপোস্ট লাগানো থাকবে, মাঝে মাঝে শান-বাঁধানো বসার জায়গা।" হরনাথ বক্তৃতার ঢঙে বলে যাচ্ছিল। ক্লাবের ছেলেরা আবার ওর নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চেঁচিয়ে উঠল।

"বাস রে! সত্যি হইব নাকি অ্যাত্তসব?" ক্রেটে করে সবার দিকে চা-বিস্কুট এগিয়ে দিতে দিতে নিতাইদা বলল।

"আলবাত হবে। হতেই হবে।" আলবাত বলাটা হরনাথের মুদ্রাদোষ ঠিকই, কিন্তু উরু চাপড়ে, মল্লযুদ্ধে আহ্বান করার মতো ঢঙে, কণ্ঠে বেশ একটা হুংকার এনে যখন বলছিল, তখন বোঝা গেল এই যুদ্ধং দেহি হালচালও ব্যবহারদোষে ইদানীং বেশ রপ্ত করে নিয়েছে ও। পতিত অবশ্য ঠোঁটের কোণে স্বভাবসুলভ (এও একরকম মুদ্রাদোষই বটে) মুচকি হাসির ভঙ্গিমা এনে, যেন মজাকে চেপে নিয়ে বলল, "সত্যি পোদু, সব দিক দিয়ে প্ল্যানটাকে লাভজনকই বলতে হবে।"

ক্লাবের ছেলেরা পুনরায় জিন্দাবাদ বলতে নিচ্ছিল, কিন্তু চার-পাঁচটা বাইকে করে গোটা দশ-বারো ছেলে এসে তক্ষুনি দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওদের একজন, চলতি সিনেমার হিরো বা ভিলেনের মতো গলায় সোনার চেন, ডান হাতে স্টিলের বালা, চোখে গগল্‌স্, বলল, "হরদা, খালপাড়ে হেভভি ক্যাচাল, খালের ওপর গজানো দোকানগুলোকে মিনুসিপ্যালটি আর পুলিশে মিলে ভাঙতে এসেছে। ক্যালাকেলির জোগাড়। এখুনি চলুন।"

হরনাথ তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে বেরিয়ে ছেলেটার বাইকের পিছনে চেপে বসল। ক্লাবের ছেলেগুলোও ভাগাভাগি করে কেউ বাইকে কেউ সাইকেলে করে হরনাথের পিছন পিছন রওনা হয়ে গেল। শুধু মনোতোষদা গুম মেরে বসে রইল।

"তোমাকে নিল না ওরা?" পতিত যতটা নম্র ভঙ্গিতে জানতে চাইল তত নিরীহ অবশ্য ছিল না প্রশ্নটা, সে-কথা বুঝতে মনোতোষদার তো নয়ই, নিতাইদারও খুব-যে অসুবিধা হলো না, তা ওর পতিতের দিকে চেয়ে পিটপিটানি হাসিতেই পরিষ্কার।

"আমারে ন্যাওনের ওরা কেডা? আমি কি ওগোর দলে নাম লিখাইছি? আমার যখন যেইখানে যাওনের ইচ্ছা হইব, সেইখানে যামু। কোন্ বাইনচোতের কী?" মনোতোষদা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। কাঁচা খিস্তিটা যে পতিতের উদ্দেশেই সেটা বুঝে খানিক হেসে নিল পতিত।

"সে তো হক কথা। আমাদের মনোতোষদা হলো গিয়া কাঠ বাঙাল। হেই সেইদিনও ওই দ্যাশে থাইক্কা শ্যাখেদের সঙ্গো সমানে লড়াই করছে। তারে কিনা পতিত তুমি ডরপোক ঠাউরাও?" খোঁচা দিতে তবে নিতাইদাও কম যায় না।

"ছি ছি, আমাকে কী যে ভাব তুমি নিতাইদা! পোদুর এত কাছের লোক

উনি, তা-ই ভেবেই আমি ও-কথা বলেছিলাম। আজ জানলাম সেটা ধারণা করা আমার মস্ত রকমের ভুল।"

"হরনাথ কাজের ছেলে, লোকের জন্য কত করে। তাছাড়া সে হিঁদুর পোলা, ঠাকুর-দেব্‌তায় ভক্তি আছে। তোমাগো মাফিক ম্লেচ্ছ না। সে ক্যান্ডিডেট হইলে এলাকার ভালো, তাই তারে সমর্থন কইরা দু-একখান কথা কইছি, তাইতে তোমার অ্যাতো হোগা জ্বলে ক্যান? তোমারও যদি শখ, দল জোগাড় কইরা দাঁড়াও-না-ক্যানে ইলেকশানে। লইড়া দেখাও। আমার গুয়ায় কাঠি দাগো ক্যান?"

"খিস্তি দাও কেন মনোতোষদা, ওটা তো আমারও কম জানা নেই। এখন তোমাকে যদি বলি তুমি একজন পাক্কা ধান্দাবাজ, পোদুকে হাত করে অনেকের পিছন কম মারনি এবং পোদু কমিশনার হলে আরও অনেকের পিছনমারার সব কায়দা এখন থেকেই ছকে রেখেছ— সেটা কি ভুল? প্রমাণ চাও তার?" পতিত স্বভাববিরুদ্ধ ফুঁসে উঠল। লোকটা দু-মুখো সাপের মতো। নিজের বিষ নেই তো কি, অন্যের বিষ ধার করে অপরের ক্ষতি করতে পারলে আর কিচ্ছু চায় না। এই কারণে পতিত এক্কেবারে সহ্য করতে পারে না ওকে।

মনোতোষদা রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল। "এইজন্যই নিতাই আমি তোমার দুকানে আসা ছাইড়াই দিছিলাম। পোদু আজ অত কইরা অনুরোধ না করলে আইতামও না।"

"আপনেও হর্‌নাথরে তাইলে আড়ালে-আবডালে পোদু বলেন? হর্‌নাথ জানে?" নিতাইদার প্রশ্নে হতচকিত মনোতোষদা আর কথা না বাড়িয়ে দুদ্দাড় বেরিয়ে যায়। নিতাইদা সশব্দে হেসে ওঠে; সেই হাসি মনোতোষদার পিছন পিছন যেন খুব লাট খেতে খেতে ওর লুঙ্গি-পাঞ্জাবিতে লেপটে গিয়ে গোরুতাড়ান তাড়িয়ে নিয়ে চলে: হু-র্-র্-র্ হ্যাট হ্যাট... হ্যাট হ্যাট হু-র্-র্-র্...

পতিতও উঠে পড়ে। দাম মেটাতে গেলে নিতাইদা বলে: "এট্টু সাইবধানে থাইকো তুমি পতিত। পোদু ম্যাখন তুমার পশ্চাতে লাইগ্‌গা পড়ছে, হালায় এমনিতে ছাইড়ব না তুমাকে। মনে কয়, হারামিটা পাড়াছাড়া কইরবার চায় তুমারে। কিন্তু ভেতরের মতলবখান যে কী, সেইডা ঠিক ঠিক বুঝবার পারি না।"

"মতলব আর কী? প্রোমোটারি! আমাদের অত্ত বড়ো জমিতে হাউসিং কমপ্লেক্স বানাতে চায়। মনোতোষদাও তাই ভিড়েছে। ইচ্ছা, ফাঁকতালে সেই হিসেবের ভাগ যদি সেও কিছু পেয়ে যায়।"

"তাই যদি হইব, তোমার তো তাইলে আরোই সাইবধানে চলা উচিত। খুনখারাবার ফন্দিও তো থাইকতে পারে।"

"সেসব নিয়ে ভেবো না নিতাইদা, আমি খুন হয়ে গেলেও ও-জমির দখল নিতে পারবে না কেউ। ওটা অলরেডি একটা চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানে দান করে দিয়েছি আমি।" ইচ্ছে করেই পতিত মিথ্যে বলল। নিতাইদা পেটপাতলা লোক। খবরটা সারা পাড়ায় রাষ্ট্র হতে বেশি সময় লাগবে না।

"কাকাবাবু, কথাটা তাহলে মিথ্যা না?"

সঞ্চিতার প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেল পতিত। ঘুরতে ঘুরতে কখন-যে সে হরেনদাদের বাড়ির সীমানার কাছে চলে এসেছে টেরই পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটায় হতচকিতও হয়ে গেল বেশ। জানতে চাইল, "কোন্ কথা বলতে চাইছ তুমি সঞ্চিতা?"

"আপনাকে তো ইদানীং দেখাই যায় না। দীপালিদিও বলছিল, আপনি নাকি বাড়িতেই থাকেন না। বাড়িঘর কোন্ আশ্রমকে দান করে কোথায় একটা চলে যাবার মতলবে আছেন। আপনাদের ভাইপো মৃণালও দেখা করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে।"

"তাই? মৃণাল কেন গেছিল, জান কিছু তার?"

"আমিই পাঠিয়েছিলাম। লোকে কানাঘুসো করে, রাতবিরেতে আপনি নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় কোথায় যান। মাঝেমধ্যে একটি মেয়েও নাকি সঙ্গী থাকে। ওরা সেসব দেখেছে স্বচক্ষে।"

"লোকের কথা নাহয় বোঝা গেল। কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস কর এইসব?"

"বিশ্বাস হয় না, তবে কেমন ভয়-ভয় করে। মনে হয় কারা যেন আপনাকে নিয়ে কু-মতলবে..." কথাটা শেষ হবার আগে গলা ধরে আসে সঞ্চিতার। 'আছে' শব্দটা আর শোনা যায় না স্পষ্ট করে।

"ধুর বোকা মেয়ে, লোকে আমার ক্ষতি করতে যাবে কেন?"

"আজকের দিনে শহরাঞ্চলে বিঘের উপরে জমি আপনার। তার উপরে আপনি ছাড়া সে-জমির উপরে আর কারও উত্তরাধিকারও নেই। লোভী মানুষের কি অভাব আছে পতিতকাকা? আশ্রম-টাশ্রমে দান করে দেয়াই বোধহয় ঠিক।"

"হুঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। তবে কী জান সঞ্চিতা, এই জোতজমি আমার পিতৃপুরুষের। যে-ক'টা দিন তাকে রক্ষা করতে পারি, চেষ্টা করতে দোষ কোথায়। তাছাড়া আশ্রম, সমাজসেবার নামে খবরের কাগজে যা-সব রিপোর্ট বেরোয় আজকাল, তাতে আস্থা পাই না আমি। এই বাড়ি, এই জমিটার প্রতি বড়ো মায়া পড়ে গেছে। স্বপ্ন দেখি, মরে গিয়ে যখের মতো আগলে আগলে রেখেছি সব।"

"একটা কথা বলি আপনাকে কাকু। একলা মানুষ আপনি। রাত্তিরে আর বাড়ির বাইরে না বেরুনোই ভালো। একলা সোজাসাপটা মানুষের শত্তুরের অভাব হয় না। সোজাসাপটা মানুষকে মতলববাজ লোকেরা খুব ভয় পায়। আর সেই ভয় থেকেই আক্রমণ করে বসে মানুষটিকে।"

সঞ্চিতার চেতাবনী শুনে পতিতের মন থেকে যেটুকু-বা ভয়-ভয় ছিল তার সবটাই উবে গেল। মৃত্যুভয়কে জয় করতে পারলে মনে এক ধরনের প্রশান্তি নেমে আসে। এ-মুহূর্তে মনেপ্রাণে সেই প্রশান্তি অনুভব করতে পেরে সে উচ্ছল হয়ে উঠল। চোখে-মুখে আপনি হাসির ভাব প্রকাশ পেল। পাছে সঞ্চিতা কিছু মনে করে, তাই হাসিটা আড়াল করতে সঞ্চিতার দিক থেকে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। দেখল, গলির মোড় থেকে হর্ন দিতে দিতে হঠাৎ বেপরোয়া একটা মোটর সাইকেল তিন-তিনজন আরোহী সমেত তাদের সামনে সশব্দে ব্রেক কষে একমুহূর্ত দাঁড়িয়েই, আবার তখন-তখনই একটা বিষম ঝাঁকুনিতে স্পিড তুলে পাঁচ-ছটা বাড়ির পরেই বাঁদিকের সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছেলেগুলোকে অচেনাই মনে হলো পতিতের। কৌতূহল-বশতই সম্ভবত, সঞ্চিতার থেকে "আচ্ছা চলি" বলে বিদায় নিয়ে দ্রুত হাঁটা দিল বাঁদিকের ওই গলিটার দিকে। কিন্তু কিছুই আর দেখা গেল না।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও এগিয়ে চলল পতিত। গলিটা এদিকে-ওদিকে এঁকে-বেঁকে একটা ইট-বেরুনো নোনা-ধরা বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। একটু তাই থমকিয়ে দাঁড়াতে হলো বাবাকে ও তাকে। এমন সময় এক বৃদ্ধা সেই বাড়ির ভিতর থেকে এগিয়ে এলেন।

"কাউর খোঁজ করেন না কি?"

"হ্যাঁ। ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরিকে। শুনেছি খুব সম্প্রতি এদিকেই ভাড়া এসেছেন ওঁরা।" বাবা উত্তর করলেন।

"তুমি কি কুঞ্জ? বনমালীদার বড়ো ছাওয়াল?"

"আপনি ভূপেনের বাবা? আমাদের হেমেনকাকা?" বলতে বলতে বাবা বৃদ্ধ মানুষটিকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন।

ভদ্রলোক ছিটকে সরে গেলেন পিছনে। "কর কী কুঞ্জ, মরণের পর আমাকে নরকে পাঠাবার চাও?"

"কেন? কী এমন করেছি কাকাবাবু?"

"ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তুমি আমার মতো নমঃশূদ্রের পা ছুঁইবার নিছিলা, আর তাইর পরেও কও কিনা কী এমন কর্‌ছো! তোমার ঠাকুরদা ঈশ্বর দুর্গানাথ বাগচি আছিলেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার। বনমালীদা সে-আমলে এল.এল.বি. পাশ দিয়া মস্ত উকিল হইছিলেন। চাইরপাশের গেরামগঞ্জের লোকেরা জমিদারের থিক্কাও তোমাগো বেশি মাইন্য কর্‌তো। সে কি এমনি এমনি? তাইর একখান মানমর্যাদা নাই?"

মানমর্যাদার এই সংজ্ঞায় পতিত এতই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে, বাবাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে যেতে দেখেও দাঁড়িয়ে রইল। বাবা ডেকে উঠলেন, "কী রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভিতরে আয়।"

ভিতরে ঢুকে পতিত দেখল তার থেকে বছর চার-পাঁচেকের ছোটো, তেরো-চোদ্দো বয়েসের একটি মেয়ে পুতুল খেলছে। একটু অবাক লাগল তার। এখনও পুতুল খেলতে ভালোবাসে! পরে বুঝতে পেরেছিল মেয়েটি হাবা গোছের। জামাকাপড়ের ছিরিছাদ নেই। ওই বয়েসে যৌবনকে লুকিয়ে রাখার স্বাভাবিক কৌশল পর্যন্ত আয়ত্ত করতে শেখেনি। অথচ ওর দিকে

তাকিয়ে পতিতের কোনোরকমের আকর্ষণই অনুভূত হয়নি। বরং অন্য রকমের একটা ভালো লাগছিল। আবার ভয়ও হচ্ছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল শৈশবের ভালো-লাগা এক জলপরির ছবির কথা। সে-জলপরির স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন বিছানায় হিসি করে ফেলেছি; দশ-বছর-বয়স-পেরুনো পতিত। লজ্জায় স্কুলে যেতে পারেনি সেদিন। বাবার তিরস্কারে মনে হয়েছিল পৃথিবীর সকলে বুঝি এ-কথাটা জেনেই ফেলেছে। কোথাও একটা লুকোতে চেয়েছিল নিজেকে, সব কিছুর থেকে; কিন্তু লুকোবার কোনো জায়গা খুঁজে পায়নি। স্বপ্নকে সেই থেকে ভয় পেতে শুরু করেছিল সে।

ইলিয়াস আর স্বপ্ন দেখতে চাইবে না। মহিষ যেমন পঙ্কের ভিতর শরীরকে প্রবেশ করিয়ে মাথা তুলে নিজেকে সর্বসমক্ষে জানান দেয়, তেমনি করে সেও বাঁশবন লাগোয়া পুষ্করিণীতে নিজেকে ছেড়ে দেবে। মাথাটাকে ঊর্ধ্বে ভাসিয়ে রেখে বাতাসের গুঞ্জন শুনবে। কিন্তু আজ পুনরায় আব্বুর জিনের সঙ্গে তার এই দ্বিপ্রহরেও মোলাকাত হয়ে গেল। পুষ্করিণীর ঈশানকোণে বসে আব্বু একখানি শাবল দিয়ে আতাগাছের গোড়ার মাটি আলগা করছিল। ইলিয়াস তার আম্মির কাছে শুনেছে আব্বুর মা, অর্থাৎ ইলিয়াসের দাদি, মরবার তিন-চার মাস আগে তার সই মণিমালাদের বাড়ি থেকে ওখানা এনে পুঁতেছিল মাটিতে। সে-বৃক্ষ এখন শরীর ছড়িয়ে দিয়ে ফুলে-ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কান্না যেন ইলিয়াসের দেহখানাকে থরথর করে কাঁপিয়ে তুলল। পানিতে ডুব দিল সে। দেখল, মস্ত বড়ো একটা মহাশোল তাকে ঘিরে ঘূর্ণিপাক দিয়ে চলেছে। ইলিয়াস যেই হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গেল, তক্ষণই পানি ফুঁড়ে উড়ে গেল আকাশে। মাথাটাকে ভাসিয়ে তুলে ইলিয়াস দেখল, কোথায় মহাশোল, কোথায়ই-বা আব্বুর জিন। এই ভরদুপুরে সাদা কুয়াশার আবরণে ডুবে রয়েছে সমগ্র চরাচর। সব কিছু থমথমে হয়ে আছে। ঘাটের দিকে এসে সন্তর্পণ পদক্ষেপে পুকুরের থেকে উঠে সে হাঁটা দিল ঘরের দিকে। লবণ-লঙ্কা-তেল দিয়ে আলুভাতে মেখে ডাল-ভাতের সঙ্গে গোগ্রাসে গিলে গিলে খেলে। ক্ষুধা থেকে এই নিবৃত্তি আজ তাকে বড়ো পরিতৃপ্তি দিতে পেরেছিল। তারপর সমস্ত দেহ যেন টনটনিয়ে উঠল। তীব্র কাঁপনে শরীর তার উথালপাথাল করতে লাগল। বিছানায় শুয়ে কম্বলের ভিতরে আগাপাশতলা ঢেকে নিলে নিজেকে। তীব্র জ্বরে গোঙাতে গোঙাতে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেল সে। তখন দুগ্‌গা পিতিমের মতো মুখশ্রী এক পরি তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "এইবারে শাদি করো তুমি ইলিয়াস। আর রাজকন্যে কেন, নিজের চোখেই তো দেখে এলে শরীরে পচন লেগেছে তার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গলে গলে পড়ছে। মনে আছে দাঙ্গার দিনগুলোতে মেয়েটাকে ওরা তুলে নিয়ে গিয়ে-

ছিল? তোমার আব্বুকে খুন হতে হয়েছিল? কতদিন আর সেই শোক-তাপ বয়ে বেড়াবে তুমি? এখন থেকে মনে করো সব মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে সময়কে অতীত করে না তুলতে পারলে জীবন থাকে না, জন্ম থাকে না, বিশ্বাস থাকে না। এইবারে শাদি করো তুমি ইলিয়াস। শাদি করো।"

"পতিতবাবু, ও পতিতবাবু বাড়ি আছেন?" কড়া নাড়ার শব্দে আর চিৎকারে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে পতিত। দরজা খুলে দেখে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার?" জানতে চায় সে।

"তেমন কিছু নয়। আপনাকে একটিবার মর্গে যেতে হবে।"

"কেন বলুন তো?"

"ক-দিন আগে বাজারের পুকুরটার ধারে যে দু-জন খুন হয়েছে, অনুমান তাদের হয়তো আপনি চিনতে পারেন, সেইজন্য।"

"আমি চিনব?"

"পাড়ার লোকেরা বলছিল যুবকটির সঙ্গে নাকি আপনার চেহারার দারুণ মিল। সত্যিই যুবকটি আপনার পরিচিত কি না বা আত্মীয়স্বজন কেউ, একটিবার সেটা নিজের চোখে দেখে জানিয়ে দিলে আমরা লাশ দুটোর সদ্‌গতি করতে পারি। আমাদের সন্দেহ ওরা মাওয়িস্ট। প্লিজ, হেল্প আস।"

পতিত বুঝতে পারল, সবই হরনাথ আর তার দলবলের কীর্তি। কোনোভাবে তাকে ফাঁসাতে চায় ওরা। পুলিশ পাঠিয়ে কি তবে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে চাইছে হরনাথ? কিন্তু পতিতও হার মানবে না কিছুতে। লড়ে যাবে। তাকে দিয়ে কোনোভাবেই বডি দুটো শনাক্ত করতে পারবে না ওরা। এমনকী সত্যিকারের জানাচেনা হলেও। অবশ্য, আপনজন যে নয়, সেটা সে নিশ্চিত। এ-পৃথিবীতে রক্ত-সম্পর্কে কেউ নেই তার। থাকলেও সে জানে না বা চেনে না তাদের কাউকে। পুলিশ দু-জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "বেশ চলুন।"

সদর দরজায় তালা দিয়ে ওদের সঙ্গে যখন সে পুলিশভ্যানে গিয়ে উঠল, দেখল পাড়ার অনেক লোক ভিড় করে আছে। বিশেষ করে হরনাথের সাঙ্গোপাঙ্গোরা। ভিড় সরিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে গেল কালো রঙের ভ্যানগাড়িটি।

মৃতদেহ দুটির দিকে চেয়ে শিউরে উঠল পতিত। মুখ দুটো থেতলে বিকৃত হয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ওরা দু-জন পাবন আর মলি নয় তো? খানিক তাই থমকে রইল সে। তারপর ছিটকে সরে এল সেখান থেকে। পরনের পাঞ্জাবির প্রান্তে নাক-মুখ চাপা দিয়ে বমি ভাব ঠেকাতে চাইল।

কিন্তু পেটের নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে খানিক পিত্তি বেরিয়ে এল। নোনা আর তেতো হয়ে গেল মুখের ভিতর।

"তাহলে পতিতবাবু, এঁরা আপনার পরিচিত, কী বলেন?" পুলিশ দু-জনের একজন, শ্মশ্রুগুম্ফহীন, অপেক্ষাকৃত প্রবীণ মানুষটি, প্রশ্নটাকে তার সামনে হঠাৎ ছুড়ে দিলেন।

"পরিচিত? কই, না তো!" পতিত নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল।

"তা কী করে হয়? বডি দুটো দেখার পর আপনার চোখ-মুখের চেহারাই বলে দিচ্ছিল, আপনি চিনতেন ওদের।"

"আপনারা ভুল ভেবেছেন। আপনার বলতে আমার কেউ নেই।" পিত্তির কারণে মুখের ভিতরের তিতকুটে স্বাদ চারিয়ে গিয়ে পতিতের কথা-বলার মধ্যে আপনিই সামান্য আমতা-আমতা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

"আপনি আলবাত লুকোচ্ছেন। আপনার মুখের ভাব, কথা-বলা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।"

পতিত উচ্চারণে সামান্য বিরক্তিভাব এনে বলল, "সে আপনাদের যাই মনে হোক-না-কেন, আমি এদের কাউকে চিনি তো না-ই, এমনকী পথে-ঘাটেও কোনোদিন চোখের দেখা দেখেছি কি না তা-ও মনে করতে পারছি না।"

"বেশ। চলুন তাহলে।"

"চলুন।"

বেরিয়ে পুলিশভ্যানে চেপে বসল পতিত। কিন্তু তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার বদলে ভ্যান সোজা থানায় গিয়ে ঢুকল।

"কী ব্যাপার, এখানে কেন?" জানতে চাইল পতিত।

"তেমন কিছু না, বড়োবাবু বলেছিলেন আপনাকে বাড়িতে নামাবার আগে একবার থানা ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে। মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার।" এই কথাগুলো বয়েসে অপেক্ষাকৃত নবীন যে পুলিশ অফিসারটি, তিনি বললেন।

পাঁচ মিনিট কোন্ ছার। এক দুই তিন চার প্রায় পাঁচ-পাঁচটি ঘণ্টা ধরে বড়োবাবু ও দুই অফিসার জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে তুলল পতিতকে। তার সমস্ত প্রতিরোধ বালিবাঁধের মতো চুরচুর ভেঙে পড়ছিল, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল কথার বাঁধন। তবু একটিবারের জন্যও কোনোভাবেই মানতে চায়নি সে লাশ দুটো পাবন আর মলির। পৃথিবীর কারও পক্ষেই ওরকম

বীভৎস থেঁতলে-যাওয়া মুখ দেখে চেনা সম্ভব নয় বডি দুটো। পোশাকআশাক আর আইডেনটিটি-মার্ক থেকে একটা অনুমান মাত্র সম্ভব। পাবন বা মলির সঙ্গে তো তেমন পরিচয় তার ঘটেনি যে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্নের খোঁজ জানা থাকবে তার! লাশ দুটো পাবন-মলির, এমন তাৎক্ষণিক অনুমান বা ভাবনা থেকে সরে এলেও পতিতের তবু সংশয় যাচ্ছিল না যে, লাশ দুটো ওদেরই দু-জনের; ওদেরকে সম্ভবত খুন হতে হয়েছে। সংশয় কখনোই প্রমাণ হতে পারে না, তাই বার বার সমস্ত ধরনের প্রশ্নের উত্তরে সে পুলিশ অফিসার তিনজনকে ঘোরের মতো একটি বিবৃতিই শুধু বলে গিয়েছে: আমি পতিতপাবন বাগচি, পিতা স্বর্গীয় নিকুঞ্জবিহারী বাগচি, নিবাস কমলপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ স্বজ্ঞানে শপথ নিয়ে বলছি, আপনার বলতে এ-দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।

তখন সেই তিন অফিসার পতিতের থেকে দূরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করে আবার ফিরে এলেন। বড়োবাবু একটি খাম এগিয়ে ধরলেন তার সামনে: "দেখুন তো, খামের উপরে কালো কালিতে লেখা আপনার নামটা কার হস্তাক্ষর?"

পতিত অবাক হয়ে দেখল এ সেই জবার দেয়া মাস্টারমশাইয়ের হারানো চিঠি। বলল, "আমার স্কুলের শিক্ষক শ্রী প্রদীপ সামন্তের।"

"বেশ, চিনেছেন তাহলে! ভেবেছিলাম এটাও অস্বীকার করবেন আপনি।"

"কেন? যেটা নিশ্চয় জানি সেটা অস্বীকার করতে চাইব কেন?"

"চিঠির লেখাগুলোকে কি মনে করতে পারেন?"

"না। কেননা যেদিন চিঠিটা পেয়েছিলাম সেইদিনই হারিয়ে ফেলি।"

"মিথ্যে বলছেন আপনি। কারণ খামটার মুখ খোলা।"

"খামটা মুখ-খোলা অবস্থাতেই আমার হাতে এসেছিল।"

"কে খুলেছিল তবে?"

"সেটা জানি না আমি।" এই চিঠির প্রসঙ্গে জবাকে সে জড়াতে চাইল না। "কিন্তু এর মধ্যে তো চিঠিটাই নেই।" বলল পতিত।

"সেটা আমাদের সেফ কাস্টডিতে আছে।" বড়োবাবু বললেন।

"আমাকে একটিবার দিতে পারেন? চিঠিটা পেয়েই হারিয়ে ফেলার দরুন ওটা পড়াই হয়নি আমার।"

"না, সেটা আর আপনাকে দিতে পারি না আমরা। এভিডেন্স হিসেবে

আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে পেশ করা হবে।” বলে, সামান্য চুপ থাকার পর স্প্রিং-দেয়া নরম গদির ঢাউশ চেয়ারের ব্যাকরেস্ট থেকে নিজেকে পতিতের দিকে যথাসম্ভব সরিয়ে এনে সামান্য ঝুঁকে পড়লেন বড়োবাবু। “সরি টু সে পতিতবাবু, তথ্যগোপন ও রাষ্ট্রের কাজে অসহযোগিতা এবং মাওবাদীদের সঙ্গে গোপন আঁতাতের অভিযোগে আমরা আপনাকে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।”

কথাটা শেষ করে মানুষটি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের বিকট সেই চেয়ারের ব্যাকরেস্টের গর্তে সেঁধিয়ে গেলেন। চেয়ারটা ককিয়ে উঠল।

পতিত হতবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। পরক্ষণেই ফ্ল্যাশব্যাকের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সারি সারি লাশ। তাদের ভিতর থেকে বিরামহীনভাবে সে খুঁজেই যাচ্ছিল পাবন আর মলিকে।